মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

গান্ধী স্মারক নিধি

বাংলা

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের সংসার আশ্রমের নাম শ্রীশরৎকুমার ঘোষ। তাঁহার রচিত মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল শ্রীমৎ স্বামিজীর প্রতিবাদ—ধর্মজগতে যে প্রচলিত অধ্যাত্মবাদে আত্মার অতি-মূল্যায়নদ্বারা মানুষের বাস্তব জীবন শোষিত হয় তিনি যেমন তাহার বিরোধী ছিলেন, তেমনই বাস্তব জীবনের যে-জাতীয় জীবনযাত্রার ফল শোষণ—সে-জাতীয় শোষণকেও তিনি কোনদিনই বরদাস্ত করেন নাই। ধনতন্ত্রবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী এই উভয়বিধ শোষণের বিরুদ্ধেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শোষণের বিরুদ্ধে এই প্রতি-বাদের সঙ্গে সঙ্গে গঠনাত্মক যে চিন্তাধারা তিনি জন-জীবনের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সামগ্রিক জীবনবাদ। এই জীবন-বাদের কর্মগত রূপের একটি মূল্যায়ন পাওয়া যাইবে মহাত্মাজীর এই গঠনকর্ম-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত চিন্তাধারার মধ্যে। জাতিগঠনের জন্য সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত একটা ব্যাপক কর্মপন্থা গোড়ায় না রাখিলে কোন বিপ্লবই দাঁড়াইতে পারে না—মহাত্মাজীর গঠনকর্মগুলির অনবদ্য প্রয়োজন সেইখানে। বর্তমান পুস্তক মানুষের সেই প্রয়োজন মিটাইবে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ১২৯০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা অগ্রহায়ণ পূর্ববঙ্গের বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাঁকরধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এণ্ট্রান্স পর্যন্ত বরিশালেই পড়াশুনা করিয়া কলিকাতায় এফ-এ ও বি-এ পর্যন্ত পড়িয়া-ছিলেন। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত প্রচলিত বৈরাগ্যবাদের প্রভাবে লেখাপড়া অপেক্ষা হরিনামকীর্তনে তিনি অধিক মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাহা কাটিয়া যায় ১৩১২-এর ১৩ই অগ্রহায়ণ সমন্বয়মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল-দেবের স্পর্শ লাভের পর। তখন হইতে এই বিশ্বকে বন্ধনের স্থান মনে না করিয়া 'এই বিশ্বই মহামঠ' এবং প্রতি মানুষ বিশ্বনাগরিক এই উপলব্ধি দ্বারাই মানুষ সত্য সুন্দর সবল ও সার্থক জীবন যাপন করিতে পারে এই সত্য তিনি নিজে বুঝিলেন ও মানুষের কাছে উপস্থাপিত

করিলেন। ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি শিক্ষকতা ছাড়িয়া সেবাব্রতে ঝাঁপ দিলেন। শোষণের বিরুদ্ধে এই জীবনবাদের কথা তিনি বহু স্থানে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের শত শত গ্রাম ও শহরে হাজার হাজার বক্তৃতাদ্বারা বলিয়াছেন, হিন্দুর প্রস্থানত্রয়—এগারখানা উপনিষৎ, বেদান্ত ও গীতা—এর ভাষ্য রচনাদ্বারা তাহার স্থায়ী দার্শনিক রূপ রাখিয়া গিয়াছেন। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেই তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া একবার ১৯২০, একবার ১৯৩০ ও শেষে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছিলেন। বিগত ১৩৬৪-এর ১৮ই চৈত্র (ইংরাজী ১৯৫৮-র ১লা এপ্রিল) শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ইহলোকের জীবন শেষ হয়। দমদমের পূর্বদক্ষিণে বাগুইআটি গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমে তাঁহার পবিত্র দেহ রক্ষিত আছে।

মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)-র প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

মহাত্মা গান্ধী
মোহনমালা
গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন
নারী ও সামাজিক অবিচার (৩য় সংস্করণ)
সত্যই ভগবান (২য় সং)
গীতাবোধ
পঞ্চায়েত রাজ
পল্লী-পুনর্গঠন
সর্বোদয়
আমার সমাজবাদ
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি
উৎপাদক শ্রম
অছিবাদ
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ
কর্মের সন্ধান
সর্বোদয়ের পথ (যন্ত্রস্থ)

ভূমিকা

একই কর্ম করে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন পন্থায়। কেহ অর্থোপার্জন করে পরের অর্থ আত্মসাৎ করিয়া নিজের জন্য, কেহ বা সদ্ভাবে নিজের জন্য বা সমাজের জন্য। উদ্দেশ্য ও পন্থার পার্থক্যে কর্মের রূপ বদলায়, কর্মফলেরও, আস্বাদনেরও। কর্ম ও কর্মফলের কোন পাকাপোক্ত রূপ নাই। যে নিজের উদর পূর্তির জন্য ভোজন করে, আর ভক্তবর রামপ্রসাদের মত যে ব্যক্তি নিজের খাওয়াকে শ্যামামাকে বা বিশ্বসংসারকে আহুতি দেওয়া মনে করে, এই দুয়ের উদ্দেশ্য, পথ ও আস্বাদন সবই পৃথক। চরখায় সূতা কাটা সম্বন্ধে মহাত্মাজী লিখিতেছেন, "এক বেচারী গরীব কাটুনীর হাতে চরখা তাহাকে এক-আধ পয়সা পাওয়াইয়া দেওয়ার যন্ত্র মাত্র। কিন্তু জওহরলালের হাতে সেই চরখাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের যন্ত্র হয়।" দিনের পর দিন পদব্রজে রাত্রি জাগিয়া অর্ধাহারে বা অনাহারে "হা জগন্নাথ হা জগন্নাথ" আর্তিসহকারে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া গৌরসুন্দর যে জগন্নাথদর্শন করিয়াছিলেন, আর যাহারা ট্রেনে একরাত্রি সুখে স্বচ্ছন্দে খাইয়া ঘুমাইয়া জগন্নাথদর্শন করিতেছে, এই দুইয়ের দর্শন কি একই দর্শন? দুইয়ের উদ্দেশ্য, পথ ও আস্বাদন সবই পৃথক। আস্বাদনে গুণগত পার্থক্যও রহিয়াছে।

তাই তো কর্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করিতে হইবে কর্মের উদ্দেশ্য কি, পথ কি। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অর্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়াছেন, রুধিরলিপ্ত রাজ্য না চাহিয়া ভিক্ষান্নে জীবিকা-নির্বাহ করিতেও যখন তিনি প্রস্তুত, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গীতা শুনাইয়াছিলেন। যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার জন্য কি প্রয়োজন ছিল "ময্যেব মন আধৎস্ব", "মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বাণী শুনাইবার? এই সব আদর্শ বাণীর সঙ্গে কর্মের কি কোনও বস্তুতান্ত্রিক সাক্ষাৎ

সংযোগ আছে? পাশ্চাত্যও তো যুদ্ধ করে, কিন্তু কৈ, সেখানে তো এত বড় বড় আদর্শের প্রয়োজন হয় না? এই প্রশ্ন খুবই সমীচীন। যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ ও তাহার পন্থা নির্ণয়ের মধ্যেই রহিয়াছে গীতার উপযোগিতা। পাশ্চাত্যের সেনানায়কগণ যুদ্ধের প্রেরণা দেন, শ্রীকৃষ্ণও দিতেছেন। অথচ দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্যের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিজেদের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার স্বার্থ রক্ষা; উপায় তাহার রক্তাক্ত পথে অপরের স্বাধীনতা হরণ। পুরুষোত্তমাশ্রিত ভারতের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হইবে ব্যক্তিস্বার্থ, সমাজস্বার্থ, জাতিস্বার্থ ও বিশ্বজনস্বার্থের সমন্বয় বিধান করা। যেখানে প্রতি ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির স্ব-এর রাজ প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই স্বরাজ। সকলের সব "স্ব" যেখানে দীপ্তিমান, তাহাই ভারতের স্বরাজ, সেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই ভারতের যুদ্ধ করা।

গীতোক্ত যুদ্ধকর্মের পিছনে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশেষ সাধনাটি রহিয়াছে, মহাত্মাজীর প্রবর্তিত অষ্টাদশবিধ কর্মপদ্ধতির অন্তরেও তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই উজ্জ্বল দর্শনটি তাঁহার 'গঠন-মূলক কর্মপদ্ধতি' নামক ছোট পুস্তিকার মধ্যে এমনই ভাবে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে, সাধারণতঃ উহা কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। কর্মেরই অপরিহার্য অপর অংশ হিসাবে অকর্মের বা আদর্শের এই দর্শনটিকে স্পষ্টভাবে জাতির জীবনে অঙ্কিত করিতে না পারিলে কর্মপদ্ধতি অব্যাহত গতিতে, স্বচ্ছন্দভাবে চলিবে না, যেমন আশানুরূপ ভাবে চলে নাই এতদিন। বিপ্লবের ভিত্তিরূপে কর্মকে বরণ না করিলে বিপ্লব শুধু ভাবুকেরই ভাববিলাস। মহাত্মাজী নিজেই লিখিতেছেন—"যদি কংগ্রেসীদের নিকট ইহার কোনও মূল্য না থাকে তবে আমাকে বাতিল করিয়া দিতে হইবে। কেন না গঠন-মূলক কর্মপদ্ধতি বাদ দিয়া আইন অমান্য করান মানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত দিয়া একটা চাম্‌চে উঠাইবার প্রচেষ্টা করা।" ইহার মধ্যে কি ব্যর্থতার বেদনাই না লুকাইয়া রহিয়াছে!

আমি ধীরে ধীরে গান্ধীজী প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতির দার্শনিক চিন্তাধারাকে ভিত্তি করিয়া পুরুষোত্তম কর্মপদ্ধতিকে জাতীয় কর্মীদের জীবনের সামনে ধরিতে চেষ্টা করিব। ইহার ফলে এমন একটি জ্ঞান ও প্রেমের প্রেরণা তাঁহাদের জাগ্রত হইবে যাহাতে কর্ম আর ভার হইবে না, কর্ম হইবে জীবনেরই আত্মাস্বাদন, জীবনের সহজ সরল অব্যাহত প্রকাশ। মহাত্মাজীর এই কর্মপদ্ধতিকে অনুসরণ করিবার আগে যদি জীবনের সমগ্রতার এই সুরটিকে খুঁজিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জাতি তাহার চির-অভীপ্সিত উজ্জ্বল ভারত, স্বরাট্ ভারত সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে—ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রম ও বুদ্ধি

"যে সমগ্র পর সত্য স্বধাম অর্থাৎ স্ব-স্থান ও স্ব-জ্যোতিদ্বারা বুদ্ধির কুহক নিরস্ত করিয়াছে সেই পরসত্যকে আমরা বিশ্ববাসী বিশ্বকে "এক বিশ্বে" (one world) গড়িয়া তুলিবার সাধনায় সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে ধ্যান করিতেছি।"—ভাগবতের গভীর ও বিস্তীর্ণ এই মহাবাণী ভবিষ্যৎ বিশ্বের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্র সংগঠনের উপরে আলোকপাত করিয়াছে। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির অন্তরে এই মহাবাণীর অভিব্যক্তিই রহিয়াছে। এই কর্মপদ্ধতির পরতে পরতে এমনই একটি দার্শনিক মতবাদ ও চিন্তাধারা ওতপ্রোত মিশানো রহিয়াছে যাহা প্রচলিত ভারতীয় দর্শন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অভিনব।

জগৎ ও কর্ম সম্বন্ধে যে চিন্তাধারার উপর অচলায়তন ভারতবর্ষের কাঠামো গড়া, তাহা সে পাইয়াছে প্রচলিত অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত হইতে। প্রতি বস্তুর অন্তরে যে সেই বস্তুরই অতীত একটি আদর্শ সত্তা ঘুমাইয়া আছে ইহার খোঁজ দিয়া অদ্বৈতবাদ অমর ও বিশ্বজয়ী ; ইহার জন্য বিশ্ব তাহার কাছে চিরঋণী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ বস্তুর বাহিরের অংশটির অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের কোনও পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়ার ফলে অন্তরের ঐ আদর্শ সত্তাটিই আজ ভিত্তিহীন শূন্যে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান ভারত আর এই শূন্যবাদের উপাসনায় ভিত্তিশূন্য, ভূমিশূন্য, অন্নশূন্য, প্রাণশূন্য বেকারের দলে পরিণত হইতে রাজী নয়। তাই আজ চাই বস্তুর অন্তর ও বাহিরের সমন্বয়, ইহারই ভিত্তিতে সব শূন্য ভরিয়া উঠিবে রসাল, জীবন্ত ও প্রগতিশীল পরিপূর্ণতায়। প্রচলিত অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াই একদিন বাঙ্গালী গৌরসুন্দর বারাণসীর বুকে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন—"মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।"

অদ্বৈতবাদই মায়াবাদ, গীতার ভাষায় ইহাই প্রজ্ঞাবাদ। এই চিন্তা-ধারার ফলেই প্রাণধারা, শ্রমধারা এবং কর্মপ্রবাহ যায় স্বাভাবিকভাবে শুকাইয়া, সর্বস্তরে ইহা হয় রুদ্ধ। জাতির ভিত্তি আজ ইহারই চাপে ধ্বসিয়া গিয়াছে।

মহাত্মাজী ইহারই ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—"আমাদের দেশে শ্রমের সহিত বুদ্ধিশক্তির একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে কর্মপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রম ও বুদ্ধির যদি 'অবিচ্ছেদ্য সংযোগ' হয় এবং উপরিউক্ত উপায়ে উহা সাধিত হয়, তবে উহা দ্বারা অপরিমেয় হিত হইবে" (খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত 'গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি', পৃষ্ঠা ১৫)। ভারতবর্ষের দার্শনিক যুগেই শ্রম ও বুদ্ধির এই বিচ্ছেদ প্রথম সংঘটিত হইয়াছে। এই বিচ্ছেদের ফলে শ্রমিক বুদ্ধিমান হয় নাই, বুদ্ধির মর্যাদা না দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমদ্বারা দিতেছে শ্রমিকদল বুদ্ধিমানদের উপর চাপ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমানগণও শ্রমিক হয় নাই, স্বয়ং শ্রমের মূল্য না দিয়া শ্রমিকের করিতেছে শোষণ। শক্তি লইয়া শ্রম ও বুদ্ধির ঐ কাড়াকাড়িতে ধুমায়িত হইয়া উঠিয়াছে সর্বত্র শ্রেণীবিদ্বেষ, সমাজশক্তিকে নিজের মুঠার ভিতর রাখিবার একটা প্রকাণ্ড হুড়াহুড়ি।

এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য মুলতঃ দায়ী প্রাণস্পর্শহীন একান্ত (absolute) "বুদ্ধি"। সে নিজকে কেন্দ্র করিয়া সমাজগঠনের দায়িত্ব লইয়াই এই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। 'একান্ত বুদ্ধি' যখন স্বতন্ত্র কর্তা, প্রাণ ও শ্রম থাকে উপবাসী। আদর্শের চক্ষু-ঝলসানো একটি চকচকে আবরণ দ্বারা বুদ্ধি বাস্তব কঠোর সত্যের মুখ আবৃত করিল; বাস্তবের দেশের সব জটিলতাকে "সোজা পথ চলার" (short-cut policy) নীতিদ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার কুহকে মানুষ সম্মোহিত হইল, বুদ্ধির সিদ্ধান্তের কাছে মাথা নোয়াইল, এবং তাহাকেই পরম সত্য বলিয়া মানিল। বুদ্ধির বিচারে প্রাণধারা, কর্মধারা, শ্রমধারা, সমাজ-সংগঠন ব্যাপারে অস্পৃশ্য হইল,

নিন্দিত হইল, নির্বাসিত হইল। শ্রমকে নির্বাসন দিয়া, শ্রম ও বুদ্ধির বিচ্ছেদ ঘটাইয়া বুদ্ধিকুহক একচ্ছত্র সমাজনেতা হইয়া বসিল। বুদ্ধির কুহকের ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, সমস্ত সুযোগ সুবিধা পড়িয়াছে বুদ্ধিমানদের ভাগে, আর শ্রমিকদের উপর চাপ পড়িয়াছে সমাজের সব দুর্যোগের, সব অসুবিধার, সব দুর্ভোগের। শ্রমিকদল বুদ্ধির অনুশীলন করিবার কোনও সুযোগ এতদিন পায় নাই। সমাজের সকল স্তরে বুদ্ধি আজ বিকৃত, কলঙ্কিত। অথচ একটি সুসংবদ্ধ সমাজ গড়িতে হইলে স্বয়ংমূল্যবান্ বুদ্ধি ও শ্রমের পরস্পরের পরিপূরক (complementary) হওয়া চাই-ই, যাহা শ্রম ও বুদ্ধির "অবিচ্ছেদ্য হৃদয় সংযোগ" দ্বারাই সম্ভব।

একান্ত শ্রম বলিয়া বাস্তব কিছু নাই, একান্ত বুদ্ধির অস্তিত্বও কোথাও নাই। বাস্তব জীবনে দুই-ই দুইয়ের সহযোগিতায় চলে। একান্ত বুদ্ধিই দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। তাই আজ বুদ্ধির দর্শনকে জীবনের দর্শনে গড়িয়া তুলিবার হাওয়া বিশ্বে আসিয়াছে। শ্রম ও বুদ্ধির মাঝে বুদ্ধি এতদিন কোনও পরিপূরকতার দর্শন প্রচার করিতে পারে নাই; সে সেখানে দেখিয়াছে শুধু পরস্পর-প্রতিস্পর্ধিতা ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। এই পরস্পর-স্পর্ধিতাকে একান্তভাবে মানিয়া লইবার ফলে কোনও কিছু এদেশে গড়িয়া উঠে নাই, যাহা বাহির হইতে আগত প্রাণশক্তির শক্ত আক্রমণকে সামলাইতে পারে। গঠনের ঝঞ্ঝাট সে মাথা পাতিয়া নেয় নাই, গড়িতে না পারার বেদনাবোধও তাহার ছিল না। তাই দীর্ঘদিন ধরিয়া এ দেশ শ্রমবিমুখ, কর্মকুণ্ঠ; অতএব পরাধীন।

অথচ এই দেশেরই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যাহা ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে উৎপন্ন মহীদাসের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, শুনাইয়া গিয়াছেন—"শেরে অস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ। চরৈবেতি চরৈবেতি"—"হে মহারাজ রোহিত, প্রগতিশীল পুরুষের প্রকৃষ্ট অগ্রগমনের পথে সকল পাপ শ্রমদ্বারা শীর্ণ হয়, হত হয়; তুমি

আগাইয়া চল, আগাইয়া চল।" পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক Bosanquet বলিয়াছেন—"Reality lies ahead, not behind." আগাইয়া গিয়া গড়িতে না পারার ক্লৈব্য এতদিন জাতিকে গ্রাস করিয়াছিল। সে শুধু পশ্চাদপসরণের কথাই দর্শনশাস্ত্র হইতে এতদিন শুনিয়াছে। পিছনে যে সরিয়া যায়, সে গড়িবে কিরূপে? অর্জুনও একদিন ধর্মের নামে কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলেন। সেদিন অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে; ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ।" দার্শনিক কোন্ চিন্তাধারার কুহক এমন করিয়া আমাদিগকে ক্লীবত্বের মাঝে টানিয়া নামাইয়াছে, কোন্ কুহকের ফলে আমরা ছিলাম পরের উচ্ছিষ্টভোজী, এবং কোন্ পরসত্যের ধ্যানেই বা এই কুহকের নিরসন সম্ভবপর হইবে, আজ নবসৃষ্টির যাত্রাপথে দাঁড়াইয়া তাহাই বুঝিবার দিন আসিয়াছে। মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতি ইহারই দিক্ নির্ণয় করিতেছে।

সমাজ ও রাষ্ট্র এমনকি জীবনের অতি ক্ষুদ্র ঘটনাটিরও সূত্র থাকে চিন্তাধারার গভীরে সুপ্ত। ইহাদিগকে নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে চিন্তাধারার সেই ভিত্তিতে টান পড়ে। ভিত্তি অবশ্য থাকে লুকাইয়া মাটিরই অন্তরে, সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে। সাধারণ লোকের চোখে তাহা পড়ে না, তাহারা শুধু দেখে ভিত্তির উপরে গড়া ইমারতই। ইমারত যত উঁচু, ভিত্তি ততই গভীর ও বিস্তীর্ণ। স্বরাজের চূড়া, স্বাধীনতার আদর্শ যত অভ্রভেদী হইতেছে, মাটির ভিতরকার অর্থাৎ জড়বাদের ভিত্তিও তত গভীর ও বিস্তীর্ণ হইতেছে, জড়দর্শন দিনের পর দিন আগাইয়া চলিয়াছে। জড় ও চৈতন্য মিলিয়া মিশিয়া সৃষ্টি ব্যাখ্যার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষী Planck-এর 'Where is Science Going' নামক পুস্তক ইহার দ্যোতনা দিতেছে। আজ আকাশের দিকে চাহিয়া পথ চলিয়া মাটিতে ঠোকর খাইয়া মরিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। আধুনিক দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্বের জড়-ভিত্তিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে।

আইনস্টিন, ফ্রয়েড, প্ল্যাঙ্ক, হাইসেনবার্গ প্রভৃতি মনীষিগণ এই নূতন দর্শনের প্রবর্তক। কার্ল মার্কসের দর্শনও বিশ্বে এক নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

মেজরিটি-মাইনরিটি, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র, ধর্ম-ঈশ্বর, নর-নারী, শ্রমিক-পুঁজিপতি প্রভৃতি নানা জটিল কুটিল সমস্যার সমাধানকল্পে এই 'সমগ্র' দর্শনটি বিশ্বমানবকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা জীবনের সকল স্তরকেই স্পর্শ করিয়াছে, প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক প্রশ্নেরই মীমাংসা দিতে প্রয়াস পাইয়াছে। যত জায়গায় মানুষ শক্ত সংস্কারে আটকাইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে মুক্তি দিবার জন্যই ইহার এই প্রচেষ্টা। মার্কস অতীত দর্শনকে বর্তমানের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইতে চাহিয়াছেন। কমিউনিজমের গড়া সমাজ-কাঠামোকে বুঝিতে হইলে যেমন কার্ল মার্কসের পূর্বের দর্শনের সম্যক্ চুলচেরা আলোচনা প্রয়োজন, বর্তমান প্রাণচঞ্চল ভারতবর্ষের কাঠামোকে গড়িয়া তুলিতে হইলেও সর্বাগ্রে প্রচলিত মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের চিন্তাধারার সহিত সম্যক্ পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন।

মায়াবাদই ছিল সনাতন ভারতের ভিত্তি। বর্তমান ভারতের প্রগতিমূলক আশা আকাঙ্ক্ষা ও তাহার বেগধর্মকে মায়াবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া মূর্ত করিতে হইলে প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন এবং পরিণামে বিফলমনোরথ হইতেই হইবে। তাই চাই প্রগতিশীল যুগরচনার সহায়ক নূতন দর্শনের সৃষ্টি, নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন। অতীতের ভিত্তি নিতান্তই স্থাণুধর্মী ; উহার উপর কোনও প্রকাণ্ড গতিশীল কাঠামোর সৃষ্টি অসম্ভব। অথচ বর্তমান ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মাদের মত সামনের দিকে। ইহার সঙ্গে ভারতকে তাল রাখিয়া ছুটিতে হইলে নবীন দর্শনের খোঁজ করিতেই হইবে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই সকলের শেষ প্রগতিদর্শন, বর্তমান যুগসমস্যার পক্ষে একমাত্র দর্শন, মানুষের ইতিহাসের অধ্যয়নে অন্য যাহা কিছু দর্শন দাঁড় করানো

যাইবে, তাহাই হইবে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে—মার্কসবাদীদের ইহাই দাবী।

আমরা দৃঢ়ভাবে বলিব কমিউনিজম শেষ দর্শন নয়। কমিউনিজম ভারতের ও বিশ্বের গভীরতম ও বিস্তীর্ণতম প্রদেশকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। ভারতের অতীতকে, ভারতের অদ্বৈত-বাদকে, ভারতের স্থিতিপ্রধান ধাতুকে সর্বতোভাবে হজম করিয়া যদি কোনও গণদর্শনের সৃষ্টি সম্ভবপর হয় তবে তাহাই শুধু ভারতের চিত্তে গভীরতম ও ব্যাপকতম সর্বাঙ্গীণ আলোড়ন আনিতে পারিবে, দুই দিনের হৈ চৈ-তে পরিণত হইবে না। ভারতের অতীতকে উড়াইয়া দিয়া, স্থিতিধর্মকে পদদলিত করিয়া কোনও একান্ত প্রগতিকে ভারতের সত্যিকার আত্মা কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না। রাশিয়ান গণদর্শনকে ভারতবর্ষ "স্বেন ধাম্না" হজম করিবে ভারতীয় গণদর্শনরূপে রূপায়িত করিয়াই। বাহির হইতে চাপানো কোন দর্শনই সে আর নিবে না। বাহিরে গণদর্শন ও গণজাগরণ ভারতীয় ছাঁচে যাহা হইতে পারে তাহাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে জীবনরূপে রাখিয়া গিয়াছেন ভাগবতে, বিশেষভাবে ভাগবতের ব্রজলীলায়; দর্শনরূপে গীতাশাস্ত্রে। স্থিতি ও গতির, শ্রম ও বুদ্ধির পরস্পরের প্রতিস্পর্ধিতা সত্ত্বেও উহারা পরস্পরের পরিপূরক—ইহাই হইতেছে ভারতীয় গণ-দর্শনের তত্ত্বকথা। মহামতি হেগেল ও মনীষী কার্ল মার্কস পরস্পর-বিরুদ্ধদের প্রত্যেকেরই স্বয়ংমূল্য স্বীকার করিয়া যে দর্শন দিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা বিশ্ববন্দ্য। কিন্তু হেগেল শেষ পর্যন্ত দুইয়ের এই স্বয়ংমূল্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, হেগেল একটি বদ্ধমুখ বৃত্ত (closed circle) দিয়া গিয়াছেন। কার্ল মার্কসের দর্শনেরও পরিণতি তাহাই হইবে। দুই-ই ভাবুকতা। যেহেতু দুই-ই abstraction।

শ্রীকৃষ্ণ গণদর্শনের মূর্ত বিগ্রহ। কমিউনিজম যেখানে শ্রম ও

বুদ্ধির, শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে পরস্পরস্পর্ধিত্বই দেখিয়াছে, ভারতীয় গণদর্শন সেখানে পরস্পরস্পর্ধিত্ব ও পরস্পর-পরিপূরকত্বের সমন্বয় (মহাত্মাজীর ভাষায় "অবিচ্ছেদ্য হৃদয়-সংযোগ") বিধান করিয়াছে। কমিউনিজম বলিবে—পরস্পরস্পর্ধিত্ব ও পরস্পর-পরিপূরকতা যখন পরস্পরবিরোধী, তখন উহাদের সমন্বয় সম্ভব নয়। কেন না হয় তাহারা পরস্পরস্পর্ধী, নয় তো পরিপূরক। দুই যুগবৎ হইতে পারে না; যে কোনও একটিকে সমাজ-গঠনের সূত্ররূপে স্বীকার করিতে হইবে। পরস্পর-পরিপূরকত্বকে স্বীকার করা অসম্ভব; কেন না বুদ্ধিমান ও পুঁজিপতিদের হাতে শাসনযন্ত্র থাকার ফলে যে রক্তশোষণ ও মোক্ষণ শ্রমিকদের হইয়াছে এবং তাহার ফলে শ্রেণীস্বার্থ লইয়া পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আর রোধ করা কিছুতেই যখন সম্ভবপর হইবেই না, তখন সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যতর পন্থা হিসাবে শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের রক্তাক্ত পথে রওয়ানা হওয়া ছাড়া বিশ্বের সামনে আর কোনও পথই উন্মুক্ত নাই।

অদ্বৈতবাদও অনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা করিয়াছে। পরস্পর-বিরোধী আলো-আঁধার, স্থিতি-গতির যখন যুগপৎ অবস্থান অসম্ভব, তখন ব্রহ্মকে হয় আলোর মাঝে, স্থিতির মাঝে, নয় তো আঁধারের মাঝে, গতির মাঝে পাইতে হইবে। সমস্ত বেদশাস্ত্রে যখন ব্রহ্মকে চিৎ, জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম আলোই, আঁধার নন্। আঁধার হেয়, অনিত্য, বন্ধন, অবিদ্যা; গতিও তাই হেয়া, অনিত্যা, উচ্ছৃঙ্খলতা। দুই দর্শনই পরস্পরস্পর্ধিত্বকে মানিয়া লইয়া দৃষ্টান্ত সহায়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছে এবং তাহারই উপর সমাজ কাঠামো দাঁড় করাইয়াছে। উহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভারতীয় অদ্বৈতবাদ জোর দিয়াছে বুদ্ধির উপর, বুদ্ধির মড়া-কাটা (Post-mortem dissection) নীতি ও সোজা পথ চলার নীতির উপর। কাজেই উহার দৃষ্টি আলোর দিকে, জটিলতা ছাঁটিয়া সমস্যার সহজ

সরল সমাধান দানের উপর ; স্থিতির উপর। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট অদ্বৈতবাদ জোর দিয়াছে শ্রমের উপর, গতির উপর। দুই-ই একান্তবাদী (Absolutist), ভাবুক (Idealist)। গতির অত্যাচার ঠেকাইতে গিয়া যেমন ভারতীয় অদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করিয়াছে স্থিতির অত্যাচার, রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক অদ্বৈতবাদও বুদ্ধির অত্যাচারের প্রতিস্পর্ধীরূপে দাঁড় করাইতে চাহিতেছে শ্রমিকদের অত্যাচার। দুইয়ের মনোবৃত্তির ভিতরই রহিয়াছে প্রকাণ্ড হিংসা ও অসত্য। সমাজ দুইকে লইয়াই জীবন্ত, তাজা, অখণ্ড। মড়া-কাটা নীতির আশ্রয়ে দুই খণ্ডই হইবে মৃত, জীবনের উষ্ণ স্পর্শ হইতে দুই-ই থাকিবে সমভাবে বঞ্চিত। দ্বিখণ্ডিত শ্রমিক-ধনিকের মধ্যে চলিবে শক্তি লইয়া প্রেতের কাড়াকাড়ি।

অস্বাস্থ্যকর, হিংসাময়, অসত্য এই অবস্থার প্রতিকার হইবে তখনই, যখন অখণ্ডের জ্ঞানে ও টানে দুইয়ের হৃদয় গলিয়া যাইবে, দুই দুই থাকিয়াই দুই দুইয়ের মাঝে সার্থক এক হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। একান্তভাবে প্রজ্ঞাকে সমাজের নায়ক না করিয়া প্রজ্ঞা-প্রাণের সমন্বয়কে নায়ক পদে বরণ করিলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। প্রাণচুম্বিত প্রজ্ঞা ছাড়া কেহই সমাজের সব প্রশ্নের মীমাংসা দিতে পারিবে না। ভারতীয় আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ ও রাশিয়ার রাজনৈতিক অদ্বৈতবাদ দুই-ই ভাবুকের মতবাদ। কেহই বাস্তববাদী (Realist) নয়। জারের একনায়কত্বের শোষণে জর্জরিত জনসাধারণের পক্ষে একনায়কত্বের প্রতিস্পর্ধিরূপেই (Anti-thesis) আসিয়া পড়িয়াছিল কমিউনিজম। সমাজতন্ত্র প্রবর্তিত হইলেও সেখানে মানুষের সনাতন ব্যষ্টির ক্ষুধা মুছিয়া যায় নাই, চাপা অবস্থায় আছে মাত্র। জারের অত্যাচারের জ্বালা যত জুড়াইবে, ততই ব্যষ্টির দাবী, ব্যষ্টির ক্ষুধা আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে। জারের অত্যাচারের জ্বালা এখনও সে জাতির বুকে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাই ব্যষ্টির দাবীবর্জিত ধনসম্পত্তির একান্তভাবে জাতীয়তাকরণ প্রভৃতি এখনও সেখানে

মর্যাদা লাভ করিতেছে। কিন্তু চিরদিন এ অবস্থা থাকিবে না, মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক গতিতেই একদিন সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের (Individualism) মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইবেই। ধীরে ধীরে দেখা যাইবে যে, সমাজতন্ত্রবাদের চাপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নিঃশেষে শুকাইয়া যায় নাই, উহা নিগৃহীত (Repressed) হইয়া লুকাইয়া আছে মাত্র।

ব্যক্তিগত ধনসম্পদের প্রশ্ন একদিন উঠিবেই। ভারতীয় অদ্বৈত-বাদের মত রাশিয়ার অদ্বৈতবাদও সন্ন্যাসপ্রধান মতবাদ ; ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ভোগ সেখানে নিন্দিত ও বর্জিত। সব ধন বিশ্বের কিংবা বিশ্বেশ্বরের, কাহারও কোন "বিশেষ" ধন থাকিবে না, থাকিতে পারে না—ইহা দুইটি দর্শনেরই সম্মত। দুই মতবাদই নির্বিশেষের উপাসক। রাশিয়ার অদ্বৈতবাদ বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে শ্রমকে দাঁড় করাইয়া, বুদ্ধিমানদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপাইয়া তুলিয়া শ্রমিকদের দল গড়িতে গিয়া ধীরে ধীরে বুদ্ধিরই কবলে পড়িল, বুদ্ধির কুহক তাহাকে সন্মোহিত করিল, বুদ্ধিমানদের মতই সে শাসন ও শোষণ শুরু করিল। বুদ্ধির প্রতি বিদ্বেষই তাহাদিগকে বুদ্ধির অপকৌশল ঐ শাসন-শোষণ শিক্ষা দিয়াছে। শ্রমতন্ত্র করিতে গিয়াও সে বুদ্ধির একচেটিয়া "সোজা পথ-চলা" ও মড়া-কাটা নীতিকেই মানিয়া লইয়াছে। কমিউনিজম আজ নিজের ভিত্তি জড়বাদকেই অস্বীকার করিবার দিকে চলিয়াছে।

শ্রমবর্জিত বুদ্ধি যেমন ভাবুকতা, বুদ্ধিবর্জিত শ্রমও তেমনি ভাবুকতা। অথচ ভাবুকতার বিরুদ্ধেই ছিল জড়বাদের অভিযান। ভাবুকতাকে একান্তভাবে অস্বীকার করিতে গিয়া কমিউনিজমও ভাবুকতা ছাড়া আর কিছুই হইবে না। বিশেষত্বহীন নির্বিশেষ কমিউনিজম ভাবুকেরই মতবাদ। কোনও ভাবুকই বহুকে বহু রাখিয়া অদ্বৈতসমাজ গড়িবার কুশল শাস্ত্র অবগত নন। সমাজ-গঠনের মূল দার্শনিক ভিত্তিতে যাহাদের রহিয়াছে পরস্পরস্পর্ধিত্ব,

তাহারা কার্যক্ষেত্রে শ্রেণী-সংঘর্ষ আনিয়া ফেলিবে, ইহাতে আর বলিবার কি আছে? দর্শনশাস্ত্রের এই শোচনীয় দৈন্য, পরাজয় ও ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণপ্রবর্তিত ভারতীয় গণদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ দুইকে স্বয়ং মর্যাদাসম্পন্ন দুই রাখিয়াই দুইয়ের অদ্বৈত সমাজ (commune) রচনা করিয়াছেন, সবিশেষ ও নির্বিশেষের অবিচ্ছেদ্য হৃদয়সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন, ইহাই পরসত্য ও অহিংসা, প্রকৃত অদ্বৈতবাদ।

এই প্রকৃত অদ্বৈতবাদে বুদ্ধিমান শ্রমিক হইবে, শ্রমিক বুদ্ধিমান হইবে, শ্রম ও বুদ্ধি কেহই কাহাকে শোষণ করিবে না। পরস্পর যখন পরস্পরের "স্ব" ও ধাম অর্থাৎ স্থান ও জ্যোতি, তখনই কুহকের নিরসন সম্ভবপর, তখনই বিশ্বের সত্যিকার স্বধামপ্রাপ্তি বা স্বরাজ-প্রাপ্তি। বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে অখণ্ড সমাজকে প্রথমেই শ্রমিক-ধনিক এই দুই দলে বিভক্ত না করিয়া, ইহাদের কোনও একজনের উপর সমগ্রের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার সমর্পণ না করিয়া, পরস্পরের রক্তারক্তির ভিতর দিয়া অগ্রসর না হইয়া কোন্ চিন্তাপ্রণালীর আশ্রয়ে সমগ্র সমাজের সমগ্রতাকে বজায় রাখিয়াই তাহাকে বিপ্লবী করিয়া তোলা যায়, পরস্পর পরিপূরকভাবে থাকিয়াই সর্বশুদ্ধ অগ্রগমন করা যায়, এই সত্য কৌশল ও অহিংস কৌশল দিবার প্রচেষ্টাই মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতির ভিতর রহিয়াছে। একটি অখণ্ড রসাল ফল বহুধা খণ্ডিত হইলে তাহার "রস" বাহির হইয়া যায়, তখন শত চেষ্টাতেও যেমন আর তাহাকে জোড়া দেওয়া চলে না, জীবন্ত অখণ্ড অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না, তেমনি একবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে জাতি খণ্ডিত হইলে সেই খণ্ডিত অবস্থা হইতে তাহাকে পুনরায় জীবন্ত এক অখণ্ড অবস্থায় ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর নয়। যে অখণ্ডের মধ্যে সব খণ্ডগুলি জীবন্ত, সেই অখণ্ডের দিকে প্রগতিযুগের যাত্রারম্ভ। "We must pass from the whole to the whole"—Bradly।

মহাত্মাজী স্পষ্টই বলিতেছেন—"বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে শাসনযন্ত্র চালাইবার ভান করিতেছি; এই পদ্ধতি সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বিরুদ্ধ পক্ষসমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রকার অস্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট দলসমূহকে এক জোট করিয়া আমরা কখনও জীবন্ত ঐক্য লাভ করিতে পারিব না। এই প্রকার আইনসভা কাজ করিতে পারে, তবে তাহা সত্যকার যাহারা শাসক তাহাদের হাত হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদকুড়া লইয়া কাড়াকাড়ির স্থান হইবে। এই সকল আইনসভা কঠোর দণ্ডপ্রয়োগের দ্বারাই শাসন করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী-দলসমূহকে একে অন্যের টুটি চাপিয়া ধরা হইতে ঠেকাইয়া রাখে। আমি ত মনে করি এই প্রকার হীনতার অবস্থা হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্ভব অসম্ভব।"—পৃ. ৭-৮। অখণ্ডকে টুকরা টুকরা করিয়া খণ্ডিত ধনিক বা শ্রমিক কাহাকেও কেন্দ্র করিয়া আমরা সমাজ গড়িব না। সমাজ গড়িব অখণ্ডকে অখণ্ড হিসাবে বাঁচাইয়া, সেই অখণ্ডকে কেন্দ্র করিয়াই। অখণ্ডত্ব জীবন্ত এক; মৃত খণ্ডসমূহের "একজোট" কখনও জীবন্ত ঐক্য প্রদান করিতে পারিবে না। আরম্ভই করিতে হইবে নবীন অখণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সমগ্র হইতে। খণ্ডিত অংশগুলির অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ের সংযোগের মধ্যে সঙ্ঘ রচনার ভিতর হইবে সেই অখণ্ডের আস্বাদন। সমগ্র হইতে কোনও দার্শনিক মতবাদ বা চিন্তাপ্রণালী আজ পর্যন্ত সঙ্ঘ গঠনের যাত্রাপথে রওয়ানা হয় নাই। মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতির মধ্যে এই অভিনব যাত্রাপথের সূচনা রহিয়াছে বলিয়া ইহা জগতে অদ্বিতীয়। অন্যান্য সমস্ত পথের সামনের দিক রুদ্ধ (closed), একমাত্র জীবনপথের পথিকের এই পথই চিরমুক্ত। জীবনবাদই (philosophy of life) সর্বযুগের শেষ বাদ, বিশেষ-ভাবে প্রগতিশীল বর্তমান বিশ্বের।

অন্যান্য মতবাদে 'রসের' স্থান নাই। খণ্ডদের এক 'জোট' তাই সেখানে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। রসস্পর্শহীন খণ্ডগুলি তাই খণ্ডভাবে

নিজ অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিয়া কোনও দিন অখণ্ড সত্তায় গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। অখণ্ড ফলকে টুকরা করিলে তো রস বাহির হইয়া যাইবেই, অথচ রসই তো জোড়া লাগাইবার একমাত্র বস্তু। অখণ্ড জীবনবাদই ভাব ও রসের সমন্বয়। তাই তো ভাগবত বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন—"পিবত ভাগবতম্ রসমালয়ম্। মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"—"হে বিশ্বের রসিক ও ভাবুকদল, আমি তোমাদের জন্য একটি অখণ্ড মঞ্চ স্থাপন করিতেছি, সেখানে দাঁড়াইয়া তোমরা 'আলয়ম্' অর্থাৎ লয়ের বা মোক্ষলাভের পূর্বে কর্মপদ্ধতিরূপে এবং পরে মোক্ষলাভের আস্বাদনরূপে এই ভাগবত-রস পান কর।" রস-ভাবের সমন্বয়ই রহিয়াছে মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতির অন্তরে উজ্জ্বলভাবে; ইহাই এই কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশে শ্রম ও বুদ্ধির অন্তরের এই পরস্পরস্পর্ধিত্ব কোন্ চিন্তাধারা দ্বারা পুষ্ট হইয়া সমাজশরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এইবার আমরা তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করিব। প্রজ্ঞাবাদের চিন্তা-প্রণালী হইতেছে এইরূপ—"জটিল কুটিল সংসার গতি হইতে মুক্তি-লাভ করিতে হইলে কর্মসংজ্ঞা অবিদ্যার হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, কেন না কর্মক্ষেত্রে থাকিলে জটিলতা থাকিবেই, জটিলতাহীন কর্ম হয় না। জটিলতা বর্জন করিতে হইলে কর্মত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। এই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভের জন্য চাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রের যাবতীয় ঘর-সংসার করা রূপ "বাজে" কর্মগুলি হইতে কর্মশক্তিকে গুটাইয়া আনিয়া বিদ্যাকর্ম ঐ আধ্যাত্মিক জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি 'কাজে'র কাজগুলির অনুশীলন করা। এই অনুশীলনের ফলে বহির্মুখী কর্মগতি নিরুদ্ধ হইবে, অন্তর্মুখী গতি-পথ উন্মুক্ত হইবে, জটিল কুটিল সংসার পিছনে পড়িয়া থাকিবে, 'একে'র সান্নিধ্যলাভ ঘনাইয়া আসিবে, জীবন সরল হইবে, চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকিবে। চিত্তশুদ্ধি পরিপক্ক হইলে বিদ্যাকর্মও ক্ষীণ হইবে, সর্ব কর্ম রুদ্ধ হইবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে চিত্ত উদ্ভাসিত

হইবে। অবিদ্যার সম্পূর্ণ নিরসনে তখনই মিলিবে হস্তামলকবৎ মুক্তিফল।"

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রচেষ্টা বাহির হইতে ভিতরে, বহু হইতে একে সরিয়া আসা। ইহার ফলে বাহিরের স্বয়ংমর্যাদার দাবী, জড়ের দাবী চির-অস্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, এবং অন্তরের দাবী, অজড় চৈতন্যের দাবী, একত্বের দাবীই একমাত্র সত্য বলিয়া ছাপাইয়া উঠিয়াছে। ঐ শাস্ত্র বলিয়াছে জড়ের দাবী, কর্মের দাবী নিতান্ত নোংরা। এই সব নোংরা দাবী বুদ্ধিমান ভদ্রলোকদের দরবারে স্থান পাইবার নিশ্চয়ই অযোগ্য। অতএব এই সব দাবী হইতে ব্যষ্টি-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বজীবনকে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইতে হইবে, নির্মল হইতে হইবে। এই দাবীগুলি হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাহির হইতে চাপানো যে কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন, তাহাই তো 'তপস্যা' বলিয়া সম্মানিত। এই চিন্তাপ্রণালীর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য বহু গবেষণার প্রয়োজন হইয়াছে, সুদূর মরুভূমি হইতে মরীচিকার দৃষ্টান্ত, "রজ্জুতে সর্পভ্রম," "শুক্তিতে রজতভ্রম" প্রভৃতি বহু একদেশদর্শী দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইয়াছে। অথচ বিশ্বের সর্বত্র এমন সব বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত সমূহ ছড়ানো রহিয়াছে, যেগুলিকে এই সব দৃষ্টান্তের সঙ্গে একত্র করিয়া এক অখণ্ড জগতেরই স্বাধীন ঘটনারূপে প্রত্যেককেই সিদ্ধান্ত স্থাপনের সহযোগীরূপে গ্রহণ করিলে জীবনবাদই প্রতিষ্ঠিত হইত। বুদ্ধি এখানেও "সমগ্র" বিশ্বের সবগুলি ঘটনার খোঁজ করে নাই, তাহার সুবিধামত দৃষ্টান্তগুলিই সে বাছিয়া লইয়াছে। সে সুবিধাবাদী, একদেশদর্শী।

বাঙ্গলার ভক্তবর রামপ্রসাদ গান গাহিলেন—"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের মত", "মলেম ভূতের বেগার খেটে, পঞ্চভূতে খায় মা বেঁটে"। প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিয়াছে "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে", "ধ্যান করবে মনে বনে কোণে"। মায়াবাদ সাহিত্য-সঙ্গীত, যাত্রা-থিয়েটার, কথকতা, প্রবাদবাক্য ও গল্প রচনার

ভিতর দিয়া ভারতের রক্তে মাংসে, অস্থিমজ্জায় শক্ত আসন গাড়িয়া বসিয়াছে। এখন এই চিন্তাপ্রণালীই আমাদের কাছে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, মানুষ জড়ের দাবী, বহির্জগতের দাবী, শ্রম ও কর্মের দাবীকে হেয় মনে করিয়া, পদদলিত করিয়া অজড়ের দাবী, অন্তর্জগতের দাবী, জ্ঞানের দাবী, নৈষ্কর্ম্যের দাবী পূরণের জন্যই সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছে। মোক্ষলাভের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে অন্তর্জগতের, নৈষ্কর্ম্যের। মোক্ষ-লাভের পন্থ স্বরূপ যে সিঁড়ি সে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সর্বোচ্চ সোপান হইতেছে নৈষ্কর্ম্য, আর সর্বনিম্ন ধাপ হইতেছে কর্ম। মুক্তি-সাধনায় কর্ম অস্পৃশ্য; নৈষ্কর্ম্যই পরম কুলীন। তাই কর্মবর্জিত নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ বিপ্লব এ দেশে এত প্রিয়। মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতি তাই এ দেশে যথেষ্ট সাড়া উৎপাদন করিতে পারে নাই।

কর্ম সাক্ষাৎ ভাবে মুক্তির বিপ্লব আনিতে পারে না; মুক্তি পাইতে হইলে চাই বুদ্ধির কূটকৌশলময় সশস্ত্র বিপ্লব, যাহার সঙ্গে সত্য-অহিংসাময় গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির কোনই সংস্রব নাই—ইহাই হইতেছে সাধারণ দেশকর্মীদের ধারণা। তাই কর্ম মুক্তির সাধনায় গৌণ, নৈষ্কর্ম্যই মুখ্য। কর্মই বন্ধন, নৈষ্কর্ম্যই বিপ্লব। এই নিষ্কর্মবাদ দর্শন ও সাহিত্যের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়া এক সম্মোহনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই আজ এ দেশ শ্রমবিমুখ, কর্মকুণ্ঠ, আরামপ্রিয়, বেকার। মুক্তির লোভে কর্মবিমুখের দল জটিলতাময় কর্ম হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, কর্মক্ষেত্র শূন্য পড়িয়া রহিল, শূন্য কর্মক্ষেত্রকে গতি-প্রধান শ্রমধর্মী কর্মীর দল বাহির হইতে দলে দলে আসিয়া দখল করিয়া বসিল। সেদিন সারা ভারতবর্ষ ঘরে-বাহিরে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, শৃঙ্খলিত হইল, পরাধীন হইল। কর্মবন্ধের হাত হইতে মুক্ত হইতে গিয়া কর্মেরই প্রতিহিংসার ফলে ভারতবর্ষ কর্মীদের কাছ হইতে দাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে। ইহাই প্রকৃতির পরিশোধ।

পারমার্থিক জীবনের সঙ্গে কর্মের যখন কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তখন যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারিয়া ফেলার অতিরিক্ত কর্মরুচি আনিবার বা কর্মশৃঙ্খলা শিখিবার কোনও প্রয়োজন বোধও হয় নাই, অবসরও মিলে নাই। সকলেই এ দেশে গোলোক-বৈকুণ্ঠের যাত্রী, মুক্তির টিকিট তাহাদের করতলগত ; ঘর গুছাইবার প্রয়োজনই বা কি, সময়ই বা কোথায় ? মুক্তি মিলিয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু দুর্ভিক্ষ, কন্‌ট্রোলের দুয়ারে ধর্না, কারাগারে মৃত্যুবরণ প্রভৃতি জনসাধারণের অসীম দুর্গতি যে মিলিয়াছে, তাহা আজ আর অনুমানের বিষয় নহে। আজও কি কর্মবিমুখদের সময় আসে নাই ভারতের যাবতীয় মর্মন্তুদ ঘটনাকে বাস্তবের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দেখিবার ও প্রতিকার করিবার ? এখনও কি ভাবুকতার সম্মোহন হইতে জাতি মুক্ত হইবে না ? আজ আর জড়বাদকে অপমানিত করিয়া আমরা বাঁচিতে পারিতেছি না। তাই তো চাহিতেছি আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "চরৈবেতি চরৈবেতি" মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জড়বাদকে হজম করিয়া, জড়াজড় নূতন বিশ্ব পত্তনের জন্য অভিযান করিতে। বাহির হইতে পলাইয়া গিয়া অন্তরের পথেই আমরা একান্ত মুক্তি খুঁজিব না, আমরা জড় ও চৈতন্যের, অন্তর ও বাহিরের সমন্বিত ভিত্তিতে স্বরাজের সৌধ নির্মাণ করিব। প্রকৃতির যুদ্ধঘোষণাকে স্বীকার করিয়া আমরা প্রকৃতির বুকেই অন্নক্ষেত্রে, প্রাণক্ষেত্রে, মনের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, আনন্দের ক্ষেত্রে মুক্তিকে জমাইয়া তুলিব। যুদ্ধ না করিয়া যে মুক্তিলাভ, তাহা ক্লৈব্য। প্রকৃতির ঘোষণা হইতেছে—

> যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
> যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥—চণ্ডী

'যে আমাকে সংগ্রামে জয় করে, আমার দর্প চূর্ণ করে, যে আমারই প্রতিবল, সে-ই আমার ভর্তা হইবে।' ভারতবর্ষকে আজ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রকৃতিকে জয় করিয়া প্রকৃতির ভর্তা হইতে

হইবে, সকল স্তরে বিশ্বের সর্বসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সেখানে মোক্ষলোক গড়িতে হইবে। জড়ের বুকেই অজড়ের শেষ বিশ্রাম, জড়ের বুকেই মোক্ষের সত্য বাস্তব আসন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—সত্য বাস্তব মোক্ষলাভের অন্য পথ আর নাই।

পথ ও গন্তব্যস্থল

এইবার আমরা মহাত্মাজীপ্রদত্ত স্বরাজের স্বরূপ ও তাহার পথের কথা আলোচনা করিব।

স্বরাজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত বাণী 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' মহাত্মাজীপ্রদত্ত স্বরাজের ব্যাখ্যাতেও সার্থক হইবে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে প্রত্যেকেই যার যার মত করিয়া দেখিতে পারে, মহাত্মাজীর স্বরাজের মধ্যেও সকল রাজেরই স্থান আছে। সকলের সব দাবী পূর্ণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সকলের গন্তব্যস্থল, পরিপূর্ণ পুরুষোত্তম। আমাদের আজিকার দিনের স্বরাজের তাত্ত্বিক রূপও এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহার মধ্যে বিভিন্নচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন প্রত্যেকেরই একটি তত্ত্বগত আশ্রয় মেলে।

'কৃষ্ণ কেমন ? যার কাছে যেমন।' প্রত্যেকের কাছে যিনি তার তার মতন, তাঁহার রূপটি কি ? যে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে, তিনিই মথুরায়, দ্বারকায়, কুরুক্ষেত্রে ; নিশ্চয়ই তিনি এক কৃষ্ণ থাকিয়াও পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেই সেই ক্ষেত্রের পরিপূর্ণ সার্থকতা প্রদান করিয়া এক অখণ্ড জীবনবস্তু, প্রত্যেকেরই গন্তব্যস্থল। প্রত্যেকের কাছে তার মত থাকিয়াও তিনি প্রত্যেকেরই উপরে ; কাহারও কাছে, কোন অবস্থার কাছেও ধরা তিনি পড়েন নাই। তাঁহার সমগ্র জীবনকে মড়া-কাটা নীতিদ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া বহু মৃত কৃষ্ণ আমরা দাঁড় করিব না। টুকরা টুকরা করিয়া আস্বাদন করিবার চরম পরিণতি হইতেছে শোচনীয় হিংসা, বিদ্বেষ ও বিশ্রী কাড়াকাড়ি।

ব্যষ্টি জীবনের আস্বাদনের পরিপূর্ণতার দর্শন ও চিত্র আঁকিবার জন্যই শুধু ব্রজের কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। কিন্তু মানুষ তো শুধু ব্যক্তিজীবন লইয়াই মানুষ নয়। সত্যিকারের মানুষের

মত বাঁচিতে হইলে মানুষের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া গতি নাই। প্রত্যেকের গন্তব্যস্থলকে সমন্বিতভাবে দেখিতে হইবে।

আমাদের স্বরাজের তত্ত্ব ও রূপও এমনই হইবে। তাহাতে প্রত্যেকেই অবগাহন করিতে পারিবে, অথচ কাহারও সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের মধ্যে তাহা আটকাইয়া যাইবে না। মহাত্মাজীপ্রদত্ত স্বরাজের মধ্যেও এমনই সর্বাঙ্গীণ মিলনের ইঙ্গিত রহিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন, "তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সত্য ও অহিংসা দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি মানে প্রত্যেকেরই স্বাধীন হওয়া অর্থাৎ জাতি, বর্ণ ও ধর্মনির্বিশেষে দেশের নগণ্যতম ব্যক্তিরও স্বাধীনতা লাভ। এই প্রকার স্বাধীনতা কাহাকেও বাদ দিয়া হইবার নয়। সেই জন্যই পারস্পরিক নির্ভরতার সহিত ইহা সম্পূর্ণ মিশ খাইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তত্ত্বে যাহা থাকে, কার্যতঃ ততটা কখনও লাভ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায় যে, জ্যামিতির রেখা বলিতে যাহা বুঝায় কোনও অঙ্কিত রেখাই সে জিনিস নয়। এই হেতু পূর্ণ স্বাধীনতা সেই পরিমাণ পূর্ণ হইবে, যে পরিমাণে আমরা কার্যতঃ ঐ সংজ্ঞার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব। পাঠক যদি মনে মনে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির সবটাই ছকিয়া ফেলেন, তবে তিনি আমার সহিত একমত হইবেন যে, যদি এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা যায় তবে সে পরিণতির ফলে আমরা যে প্রকারের স্বাধীনতা চাই তাহাই পাইব।" ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "মনে করুন দেশের চল্লিশ কোটি লোকই রচনাত্মক কর্মপদ্ধতি সম্পন্ন করিতে বসিয়া গেল। ইহা দ্বারা যে সম্পূর্ণ স্বরাজলাভ হইবে, স্বরাজ বলিতে যাহা কিছু বুঝা যায় সে সমস্তই, বিদেশী শক্তিকে ভারত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই, সে কথা কি বলিবার প্রয়োজন আছে?"

মহাত্মাজীর মতে তাঁহার স্বরাজের মধ্যে "নগণ্যতম ব্যক্তিরও স্বাধীনতা লাভ" থাকিবে, কাহাকেও বাদ দিয়া ইহা হইবার নয়। ইহা হিন্দুরাজও নয়, মুসলমানরাজও নয়, মেজরিটিরাজও নয়, মাইনরিটি

রাজও নয়, শ্রমিকরাজও নয়, ধনিকরাজও নয়। একান্তভাবে কাহারও কাছেই এই স্বরাজ ধরা পড়িবে না। ইহা প্রত্যেক বিশেষ রাজের অতীত সর্বরাজসমন্বিত স্বরাজ। গণ্যমান্য ও নগণ্যতম প্রত্যেকটি মানবের স্ব যে রাজে স্বয়ংপূর্ণ, প্রত্যেকের স্ব-ই যে রাজে সকলের স্ব, যে রাজে সকলের সব স্বয়ংপূর্ণ স্ব সঙ্ঘবদ্ধতার ভিতর দিয়া নিজের স্বকে গড়িয়া তুলিবার সমান সুযোগ পাইতেছে, সেই রাজই স্বরাজ—ভারতীয় স্বরাজের ইহাই তাত্ত্বিক দৃষ্টি। আজ খুব স্পষ্টভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে যে, কোনও ব্যষ্টি স্ব-ই একাকী নিজের সত্তা, চৈতন্য, আনন্দ ও মুক্তি আস্বাদন করিতে পারিবে না। নিজের স্বকে সত্য সার্থকরূপে পাইবার তাগিদেই তাহাকে বিশ্বের সব স্ব-এর মাঝে গলিয়া গিয়া জমিয়া উঠিতে হইবে। প্রতিটি ব্যক্তি যে রাজের মধ্যে স্বাধীন, স্বাধীন প্রতিটি স্ব যে রাজের মধ্যে পরস্পরের দাবী মানিয়া লইয়া "পারস্পরিক নির্ভরতার সহিত" সম্পূর্ণ মিশ খাইয়া থাকিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প এবং এই ছাঁচে বিশ্বসঙ্ঘ গঠনের জন্য উন্মত্ত, সেই রাজ-ই তত্ত্বতঃ স্বরাজ। প্রহ্লাদ ভাগবতে বলিয়াছেন—"নৈতান্ কৃপণান্ বিহায় বিমুমুক্ষে"—এই সব কৃপণদের পরিত্যাগ করিয়া আমি বিমুক্তি চাই না। দুনিয়াকে লইয়া মুক্তির আস্বাদন প্রচার করিয়াই ভারতীয় পুরুষোত্তম-দর্শন অদ্বিতীয়, অভিনব। কাহাকেও বাদ না দিয়া, সকলকে লইয়াই মুক্তির যে অভিযান, তাহাই সত্য-অহিংসা দ্বারা স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং ইহাই স্বরাজের তত্ত্বকথা।

সকলের সব স্ব-এর সব দাবীই সত্য ; এই সব স্বতঃসিদ্ধ সত্য, দাবী কোনও শক্তিমানের চাপেই যে মুছিয়া যাইবে না, ইহার চেয়ে পর সত্য আর কি আছে ? সরল প্রাণে সকল যুক্তিসহায়ে এই সব সত্য দাবীকে মানিয়া লওয়া এবং তাহাদের কার্যাত্মক রূপ দিবার জন্য প্রাণখোলা প্রযত্ন করাই অহিংসা। এই সত্য ও অহিংসা যখন যেখানে যতটুকু সঙ্ঘবদ্ধতার মূল সূত্ররূপে স্বীকৃত হয়, তখন সেখানে

ততটুকুই ফুটিয়া উঠে ভারতীয় স্বরাজ। নমনধর্মশীল এই অখণ্ড বিশ্বটা যেমন রাজনৈতিক দৃষ্টিতে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক দৃষ্টিতে সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক, এবং এই ভাবে প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ হইতে যেমন ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে, স্বরাজ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়া আসিতেছে। নমনধর্মশীল স্বরাজের রূপ সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতবাদ (-ism) এই ভাবেই সম্ভবপর হইয়াছে। প্রত্যেকটিই স্বয়ংপূর্ণ, অথচ সমগ্র জীবনে কোনও একটিই একান্তভাবে সত্য নয়। স্বরাজের সর্ববিধ রূপের সমন্বয়ই স্বরাজের পরিপূর্ণরূপ।

তত্ত্বতঃ স্বরাজ বস্তুকে "নিঃশেষে" পাওয়া যায়, কেন না উহা জ্ঞানস্বরূপ, অনুভবস্বরূপ। যখন জ্ঞানে, অনুভবে, প্রেমে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে সকলের সব দাবী সত্য ও সনাতন, সকলকে "মিশ খাওয়াইয়াই" স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, তখনই লাভ হইবে স্বরাজের তাত্ত্বিক আস্বাদন। কিন্তু প্রকৃতির ক্ষেত্রে তত্ত্বের এই জ্ঞান, অনুভব ও আস্বাদনকে জমাইয়া তুলিতে হইলে অনন্তকাল ধরিয়া স্বরাজের পিছু পিছু ছুটিতে হইবে, ধরি ধরি করিয়াও ধরা যাইবে না। তাই তো শ্রুতি বলিয়াছেন—"যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ"—আমাদের মধ্যে যাহারা জানিয়াছেন তাঁহারা জানিয়াছেন যে, তাঁহারা যে জানেন না তাহাও নয়, জানেন যে তাহাও নয়। জানা ও না-জানার এই দোললীলায় স্বরাজসুন্দরকে অনন্তকাল ধরিয়া পাইতে হইবে।

স্বরাজের অখণ্ড রূপ ভাঙ্গিয়া যাহারা হিংসা-অসত্যের পথে কোনও একটি মৃত, জীবনহীন রূপ-কল্পনাকে কার্যাত্মক করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের সেই স্বাধীনতা নিঃশেষে পাওয়া হইয়া যায়। কোনও দলের এই নিঃশেষে পাওয়ার চাপে অন্য সব দলের 'পাওয়া'র দাবী থাকে উপবাসী, ধীরে ধীরে হয় সেখানে শ্রেণীসংঘর্ষের সৃষ্টি। এইভাবে প্রতিবার শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে বার বার নূতন করিয়া স্বরাজের

রূপ-কল্পনা স্থির করিতে হইয়াছে বহু রক্তাক্ত বিদ্রোহের পথে। একবার "একান্ত করিয়া পাওয়া", কিছু পরেই আবার তাহাকে একান্তভাবে হারানোর মধ্যে রহিয়াছে যুক্তিশাস্ত্রের ও মুক্তিশাস্ত্রের কর্মপদ্ধতিগত দৈন্য। জারের রাজ্য ভাঙ্গিয়া কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র দেশের বুকে যে রক্তপাত কমিউনিস্টগণ করিয়াছে, তাহাতে রাশিয়ার অন্তরাত্মার তর্পণ হইয়াছে কিনা ভবিষ্য যুগই তাহার বিচার করিবে। জারের রাজও রাশিয়ার রাজ, কমিউনিজমও রাশিয়ার রাজ। রাশিয়া জারের আমলেও স্বাধীন, আজও স্বাধীন। এই হাত বদলানোর মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের কতখানি হার-জিত হইয়াছে ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিবে। জারের যাহা ছিল একান্ত-ভাবে 'পাওয়া', সেই পাওয়া একদিন কমিউনিজমের ধাক্কায় না-পাওয়ায় পরিণত হইল। আজ কমিউনিজম দাবী করিতেছে যে, তাহাদের সত্য মুক্তি 'পাওয়া' হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কে জানে কবে আবার তাহাও না-পাওয়ায় পরিণত হইবে। তাহার এই পরিণতি যে হইবে, তাহা যুক্তিশাস্ত্র দৃঢ়ভাবে বলিতে পারে। কেন না যাহা একান্তভাবে 'পাওয়া', একদলকে দাবাইয়া অন্য দলের 'পাওয়া,' সে পাওয়ার সামনের দিক্ রুদ্ধ, সে পাওয়া স্থিতিধর্ম্মময় (static)। কোন নিশ্চিত পাওয়াই এই সমগ্র বিশ্বে সম্ভব নয়। যেখানে পাওয়া ও না-পাওয়ার সমন্বয়ে অনন্ত কাল বসিয়া না-পাওয়ার মধ্যে হইবে পাওয়া, সেই পাওয়াই হইতেছে সত্য বাস্তব পাওয়া।

সমগ্র স্বরাজকে কাটিয়া তাহাকে পাকাপাকি রাজতন্ত্রই করা হউক, আমলাতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র বা শ্রমিকতন্ত্র যাহাই করা হউক না কেন, তাহারা হিংসা ও অসত্যের আশ্রয়ে রক্তরাজই প্রতিষ্ঠা করিবে। সব তন্ত্রের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা চলিতেছে। সশস্ত্র রক্তাক্ত বিদ্রোহ দ্বারা যাহা পাওয়া হইয়াছে, রক্তনদী বহাইয়াই যাহাকে টিকাইয়া রাখিতে হইতেছে, হাতছাড়া হওয়ার বেলায়ও তাহা রক্তস্রোত বহাইয়াই বিদায় লইতেছে। এমন অস্বাস্থ্যকর অবস্থা

'সমগ্র' বিশ্ব কখনও স্বীকার করে না। দুই সতীনের ঝগড়ায় মারা যায় মাঝখানের স্বামীই। ধনিকরাজ ও শ্রমিকরাজের ঝগড়ার ফলে দেশের শক্তি-সামর্থ্যের যে কতখানি ক্ষয় হয় তাহা দেশের অন্তরাত্মাই বুঝিতে পারে। হিংসাদ্বারা যে স্বাধীনতা প্রাপ্তব্য, তাহার সম্বন্ধে মহাত্মাজীও ইহাই বলিতেছেন, "অপর দিকে দেখা যাইবে হিংসার দ্বারা যে স্বাধীনতা প্রাপ্তব্য, তাহার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কোনও একটা পূর্ণ সংজ্ঞাই দেওয়া যায় না ; কেন না উহার মধ্যে এই অবস্থাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, দেশের ভিতরের যে দলটা সব চাইতে বেশী কার্যকর শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে, সেই দলেরই প্রাধান্য হইবে। উহাতে অর্থনৈতিক বা অন্য প্রকার সমতা প্রাপ্তির কল্পনাই করা যায় না।"

কোন দল হিংসার পথে অপরকে দাবাইয়া যে স্বাধীনতা আনে, উহাকে যখন পরবর্তীকালে অপর নিপীড়িত দলের হাতে যাইতে অহরহই দেখা যায়, তখন উহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কি করিয়া সম্ভব হইবে ? উহার ব্যবহারও তো আজ একরূপ, কাল একরূপ। যাহা সদা-একরূপ, তাহাই তত্ত্ব। বৃটেনের পার্লামেণ্ট হইতে চার্চিল গেলেন, এ্যাটলি আসিলেন—এই যাওয়া-আসার কোনও একরূপতা না থাকায় উহাদের কোন তাত্ত্বিক মূল্য নাই। তত্ত্ব চার্চিল বা এ্যাটলি কেহই নহেন। তত্ত্ব হইতেছে সদা-একরূপ ব্রিটিশ জনসাধারণ। সেই জনসাধারণকে অবলম্বন করিয়া যে তন্ত্র, বৃটেনের সেই স্বাতন্ত্র্য এ্যাটলি-চার্চিলকে ছাপাইয়াই সদা-একরূপ। স্বতন্ত্র জনসাধারণ দেশকালের বিচারে যাহাকে ইচ্ছা গদিতে বসাইতে পারে, যাহাকে ইচ্ছা সরাইতে পারে, স্বতন্ত্র বৃটেন যাহাকে ইচ্ছা অগ্রে করিয়া ব্যবহার চালাইতে পারে। সব তন্ত্রের বাহিরে রহিয়াছে তাহার স্বাতন্ত্র্য। সদা-একরূপ জনসাধারণের স্বাতন্ত্র্যই "তত্ত্ব" ; তত্ত্বরূপী সেই স্বাতন্ত্র্যের দেশকাল-উপযোগী আস্বাদনই হইতেছে তাহার ব্যবহার। এক-রূপ, সত্য স্বাতন্ত্র্যেরই তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক ব্যাখ্যা দেওয়া

চলে ; জাতিকে নিত্য ভাঙ্গা-গড়ার রক্তাক্ত পরীক্ষা সেখানে করিতে হয় না।

এইবার স্বরাজের পথ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা স্বরাজ-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ সম্বন্ধে অগ্রে আলোচনা করিয়া তাহার পর সেই আলোকে স্বরাজসাধনার পথের আলোচনা করিব। ভগবান বলিয়াছেন—"কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম কিংবা অন্যান্য শ্রেয়ঃসমূহ দ্বারা যাহা কিছু পাওয়া যায়, আমার ভক্ত ভক্তি-যোগ দ্বারা সেই সব অনায়াসে লাভ করে ; স্বর্গ, অপবর্গ বা আমার ধামও লাভ করে, যদি কোনও কিছুর জন্য সে বাঞ্ছা করে।" ভক্তি-যোগ দ্বারা যখন সব সাধনের ফল পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই ভক্তিযোগসাধনার ভিতর সব সাধনার সমন্বয় রহিয়াছে। বিশেষ বিশেষ সাধনায় বিশেষ বিশেষ ফল প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু সর্ববিশেষসমন্বিত ভক্তিযোগসাধনায় সর্ববিশেষসমন্বিত ফলই লাভ হইয়া থাকে। সর্ব-সাধনার সমন্বিত ভক্তিযোগসাধনার মধ্যে সব সাধনাগুলির এমন একটি কৌশলপূর্ণ অপূর্ব সমাবেশ রহিয়াছে, যাহার জন্য কোনও সাধনটিই আংশিক ফল দান করে না, সকলেই সকলের পরিপূরক হইয়া প্রসব করে সমগ্র ফল।

সাধনার মধ্যেও পরস্পরস্পর্ধিতা রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কর্ম ও জ্ঞান পরস্পরস্পর্ধী। কর্মের দৃষ্টি বাহিরের দিকে, জ্ঞানের দৃষ্টি অন্তরের দিকে। অথচ এই পরস্পরবিরোধী সাধনাদ্বয় ভক্তিযোগের ভিতর পরস্পরবিরোধী হইয়াও পরিপূরক ভাবে রহিয়াছে। তাই প্রত্যেকে নিজ নিজ ফলও দিতেছে, পারস্পরিক নির্ভরতার দ্বারা অন্যের দেওয়া ফলকেও স্বীকার করিয়া লইতেছে, নিজের দেওয়া ফলের সঙ্গে তাহাদের সমন্বয়ও করিতেছে। এই সর্বফলসমন্বিত মুক্তিঘন প্রেমফলের মধ্যে সর্বফল রহিয়া যাইতেছে বলিয়াই ভগবান বলিতেছেন যে, স্বর্গ, অপবর্গ ও মদ্ধামও মিলিতে

পারে যদি কখনও ভক্ত তাহা চায়। প্রেম যে চায়, সে তো স্বর্গও চায় না, মুক্তিও চায় না, ভগবানের ধামও চায় না। তাহার চাহিবার বিষয় শুধু বিশ্বের সেবা, বিশ্বেশ্বরের সেবা।

ঠিক এই দৃষ্টিতে দেখিলে স্পষ্ট অনুভব হইবে যে, মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতির মধ্যেও রহিয়াছে সর্ববিধ রাষ্ট্রসাধনার সমন্বয়—তাহা রাজতন্ত্রীদেরই হউক, আমলাতন্ত্রীদেরই হউক, আর সমাজতন্ত্রীদেরই হউক। এই সমন্বয় হইতেছে জনসাধারণের সেবার মধ্যে। সমগ্র জনসাধারণের যিনি সেবক, মুক্তির সর্ববিধ রূপ তাহার করতলগত। তাই তো তিনি লিখিতেছেন—"ইহা দ্বারা যে পূর্ণ স্বরাজ লাভ হইবে, স্বরাজ দ্বারা যাহা কিছু বোঝা যায় সে সমস্তই—বিদেশী শক্তিকে ভারত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই যে সম্ভব, সে কথা কি আর কাহারও অস্বীকার করিবার পথ আছে?" মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতির মধ্যে সর্বসাধনার এমন একটি কৌশলপূর্ণ সমাবেশ রহিয়াছে যে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এই সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে তিনি নরনারায়ণের শ্রীচরণতলে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই।

নরনারায়ণই তাঁহার ইষ্ট, তাঁহার "রাম"। বিশ্বমানবকে পরিপূর্ণ সার্থক জীবন লাভ করিতে হইলে তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে সর্ব-ক্ষেত্রে। তাহার রাজনৈতিক চেতনা লাভ চাই, সমাজের শুচিতা চাই, অর্থনৈতক মর্যাদা চাই, বিশ্বের দরবারে দাঁড়াইতে হইলে যাহা কিছু সংগঠন সবই চাই, আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলিক সূত্রসমূহের অনুশীলনও চাই। মহাত্মাজী তাই তো সংগঠনকে সব দিকে ছড়াইয়া জাগরণ ও উন্নয়ন যাহাতে সহজ হয়, তাহারই প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনার যে অষ্টাদশবিধ রূপ রহিয়াছে তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকদের সাধনার ধন সত্য-অহিংসা রহিয়াছে, নারীর স্বয়ংমূল্য আর মর্যাদা লাভের আন্দোলন রহিয়াছে, হিন্দু-মুসলমানপ্রমুখ সম্প্রদায়ের কোলাকুলির কথা রহিয়াছে, আইন অমান্যরূপ রাজনৈতিক

ক্ষেত্র তো আছেই, চরখাকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক সমতার মূল সূত্রগুলি শিক্ষার বন্দোবস্তও আছে (যাহাকে তিনি খাদি-মনোবৃত্তি বলিয়াছেন), কৃষক-কৃষাণের জীবনের ব্যথা রক্তাক্ত পথে না গিয়া অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক উপায়ে দূর করিবার পন্থা রহিয়াছে, ছাত্রদের ছাত্রজীবনের সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসাধনায় যোগ দিবার আহ্বানও রহিয়াছে, কুষ্ঠ রোগী, অস্পৃশ্য, আদিবাসীদের ধোয়াইয়া পাখলাইয়া তাহাদের জীবন-ইতিহাস লিখিয়া বিশ্বদরবারে উপস্থিত করিবার জন্য আকুলিবিকুলি আছে, মাতৃভাষায় চিন্তা আদানপ্রদানের ভিতর দিয়া মানুষের সহজ জীবনকে আলোড়িত করিবার দিকও আছে—এক কথায় বলিতে গেলে একটি সভ্য জাতির পক্ষে সমগ্রের আদর্শে জীবন গড়িতে হইলে যত দিকের যত সংস্কার প্রয়োজন, সর্ববিধ সংস্কারের দিকই ইহার মধ্যে রহিয়াছে।

তাঁহার প্রবর্তিত কর্মপন্থা নিখুঁত। তথাপি এই কর্মপন্থার মধ্যে ভিখারীদের ও সন্ন্যাসীদের স্থান থাকা আমরা নিতান্তই প্রয়োজন মনে করি। সর্বহারা ভিখারীদের বুকভরা বেদনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা না থাকিলে পুস্তিকাটির অঙ্গহানি হয় বলিয়া মনে করিতেছি। জগন্নাথের এই রথযাত্রায় রথরজ্জু টানিবার জন্য সন্ন্যাসীদিগকে সহযোগী হিসাবে আহ্বান না করায় ভুল হইয়া যাইতেছে। যত শীঘ্র সম্ভব ইহার প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

মহাত্মাজীর এই কর্মপদ্ধতি একটি অখণ্ড সমাজের সকল দিকই স্পর্শ করিয়াছে, সর্বাঙ্গীণ সমাজ সংস্থাপনের সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে। যদি কোনও বিশেষ রাজ প্রতিষ্ঠার দিকেই তাঁহার ঝোঁক থাকিত, তবে নারী-উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খাদি-প্রচার প্রভৃতি দিকগুলির উল্লেখ করিতেন না। নারী-উন্নয়ন ছাড়াও ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, নারীগণ আন্দোলনে যোগদান না করিলেও হিংস্র স্বাধীনতা আটকাইত না, গ্রাম-উন্নয়নের প্রচেষ্টা

স্বরাজের পরে করিলেই শোভা পাইত, অস্পৃশ্যতা বর্জনের কোনও সার্থকতা নাই হিংসার পথে স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিলে। কিন্তু ইষ্ট যাহার ভারতের গণ-নারায়ণ, যাহাদের আঙ্গিনায় তিনি চাহিতেছেন গণ-পরিষদ রচনা করিতে, তাঁহার পক্ষে সর্বসাধারণের দ্বারা এই আন্দোলন পুষ্ট না হইলে জগন্নাথের অগ্রগমনশীল রথের রজ্জু ধনিক, শ্রমিক, নরনারী, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, সুস্থ-রোগী, যুবক-বৃদ্ধ সকলে আকর্ষণ না করিলে কেমন করিয়া জগন্নাথের রথ চলিবে? জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজন যেখানে রথের ধারক ও বাহক, সেখানেই সত্য পরিপূর্ণ স্বরাজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। জনসাধারণের দুয়ার হইতেই কর্মীদের অভিযান শুরু করিলে দেখা যাইবে স্বাধীনতার যতখানি বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক রূপ বিশ্বের দরবারে যে কোনও রাজনীতিবিদ্ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাদের সেবার ফাঁক দিয়া সেই সবগুলিই সহজে লাভ হইয়া যাইবে। অথচ কোথায়ও আটকাইয়া গিয়া শ্রেণী-স্বার্থ লইয়া রক্তারক্তি করিবার দরকার হইবে না, স্বরাজের আস্বাদন অনন্ত কালের হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে স্তরে স্তরে আগাইয়া যাইতে থাকিবে। স্বরাজ ও তাহার সাধনা সম্বন্ধে ইহাই পুরুষোত্তম ভারত-বর্ষের অবদান। গীতার ইহাই "ঊর্ধ্বমূল সাধনা"। স্বরাজসাধনার মূল রহিয়াছে সব মতবাদের ঊর্ধ্বে গণ-নারায়ণের শ্রীচরণতলে। সমস্ত সাধনা ও শক্তির উৎস হইতেছে জনগণ। মূল হইতেই বৃক্ষ রস আহরণ করে, তাহাতেই সে সার্থক। ভারতের স্বরাজের সাধনা ও মূল জনসাধারণের রস আহরণ করিয়াই সফল ও সার্থক হইতে চাহিতেছে।

আমরা স্বরাজের মধ্যে মানবসমাজের সর্ববিধ রাজনৈতিক আদর্শ সমূহের এবং সেবার মধ্যে তাহার সর্ববিধ কর্মপন্থারও সমন্বয় দেখিয়াছি। এইবার আমরা পথ ও গন্তব্যস্থলের সমন্বয় আস্বাদন করিব। পথ ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে প্রাণস্পর্শবর্জিত প্রজ্ঞা বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে, পথের বাহিরে গন্তব্যস্থানের নির্দেশ দিয়াছে, পথের যেখানে শেষ সেই-খানেই গন্তব্যস্থান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ইহারাও ধরিয়া

লইয়াছে যে, সব পথে যখন একই স্বাধীনতা মিলিবে, তখন যে পথ সর্বাপেক্ষা সহজ এবং যে পথে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহার অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সব নদী যখন একই সাগরে পৌঁছায়, তখন নদীর বাছাবাছি করিবার কি প্রয়োজন আছে? যে নদী বহিয়া সোজা অল্প সময়ে সাগরে পৌঁছানো যায়, কোন্ বুদ্ধিমান না সেই নদীপথে রওয়ানা হইবে? সেইরূপ স্বরাজ লাভের জন্য হিংসা বা অহিংসা যে কোন পথেই স্বরাজ আসিলেও, পথ হিসাবে দুই সমান হইলেও হিংস্র উপায়ে যখন সহজে ও শীঘ্র স্বরাজ আসিতে পারে, অতএব সশস্ত্র রক্তাক্ত বিদ্রোহই সবচেয়ে বেশী কার্যকর, অল্প সময়সাপেক্ষ। এই বিচারের ভিতর ভুল রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, পথ যে কেমন করিয়া গন্তব্যস্থলকে সৃষ্টি করে, ইহা এতদিন বুদ্ধিতে ধরা পড়ে নাই। পায়ে হাঁটিয়াও জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া যায়, রেলেও যাওয়া যায়। জগনাথ দর্শন কি এই দুই পথেই এক? বাহিরের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে, রেলে গেলে সময়ও লাগে কম, শ্রমও হয় কম, অতএব রেলে যাওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ, জগন্নাথ দর্শন যখন দুই ক্ষেত্রেই একরূপ রহিয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই এই যুক্তির অসারতা ধরা পড়িবে। আরামে শুইয়া ঘুমাইয়াও জগন্নাথ দর্শন হইল, আর মহাপ্রভু "হা জগন্নাথ" "হা জগন্নাথ" বলিয়া আর্তি সহকারে এক পা এক পা অগ্রগমন করিয়া মাসের পর মাস অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন, এই দুই দর্শন কি এক দর্শন?

আরামে সমস্ত পথ কাটাইয়া হঠাৎ পথের শেষে পাইলাম যে জগন্নাথ এবং পথের জটিলতা প্রতি পদবিক্ষেপে জগন্নাথের প্রেমে ভেদ করিতে করিতে মিলিল যে জগন্নাথ—দুইয়ের মধ্যে রহিয়াছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ঘুমাইয়া যে পাইল, তাহার জগন্নাথের মূল্য কতটুকু?

দ্বিতীয়তঃ, যে পাইয়াছে 'হঠাৎ', হারাইবেও সে তাহা 'হঠাৎ'।

জগন্নাথ তো হঠাৎ পাইয়া হঠাৎ হারাইবার বস্তু নন ; তাঁহাকে যে নিত্যকালের জন্যই পাইতে হইবে। যাহারা 'সহজে' 'হঠাৎ' স্বরাজ পাইতে যায়, তাহারা তাহা হারাইবেও সেইরূপ সহজে ও হঠাৎ। জারের রাজতন্ত্র হঠাৎই গিয়াছে। জনসাধারণের জটিল কুটিল প্রশ্নগুলিকে সে শক্তির চাপে 'সহজ' করিয়া লইতেই চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা সহজ হয় নাই। বিশেষতঃ যাহারা রক্তাক্ত বিদ্রোহের পথে স্বরাজ পাইতে চায়, তাহাদের স্বরাজ ও সত্য অহিংসার দ্বারা পাওয়া স্বরাজ কি একই বস্তু? উহারা সম্পূর্ণ পৃথক্। সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে প্রাপ্ত স্বরাজের মধ্যে থাকে একদলের হাতে কর্তৃত্ব, অন্যদল থাকে শক্তির চাপে নিষ্পেষিত, সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় অধিকারবর্জিত।

তৃতীয়তঃ, যাহারা উপার্জন করে, তাহারাই ভোগ করে—ইহাই প্রত্যক্ষ সত্য। উপার্জনের সময় যদি জনসাধারণকে সহযোগী না করা যায়, যদি ধনিক বা শ্রমিক একাকীই স্বাধীনতা লাভ করে, তবে তাহা কি কেহ দেয়, না দিতেই পারে? দিলেও রাখিতে পারে না। কেন না উপার্জনের কৌশল যে জানে না, রাখিবার কৌশলও সে জানে না। হঠাৎ একদিন সে দেখিবে, বস্তু হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। পথও সৃষ্টি করে গন্তব্যস্থলকে, এই পরসত্য আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। তাই তো রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন---

পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা,
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছানো আর চলা।—'ফাঁকি'

পথগুলি যদি টুকরা টুকরা না থাকিয়া সর্বপথ সমন্বয়ে সিদ্ধ হয়, তখন পথই গন্তব্যস্থল, গন্তব্যস্থলই পথ। যখন পথের বাঁশী সাধকের কানে বাজিয়া উঠে, তখন প্রতি পথের পথিক অনন্ত পথের পথিকের গলা ধরিয়া গন্তব্যস্থলকে প্রতি "পায়ে" "পায়ে" আস্বাদন করিয়া অনন্তকাল চলিতে থাকে। পথে চলার এই ফাঁক দিয়া সব কিছু গন্তব্যস্থলের অধিকার আপনা আপনি করতলগত হয়। তখন "পৌঁছানো আর চলা" এক হইয়া যায় চলার আনন্দে। তাই তো

কবি গাহিতেছেন—'চলার বেগেই পথ কেটে যায়, করিসনে আর দেরী।" পথ কাটিয়া সহজ করিতে গেলে পথ কাটা যায় না, পথ হয় জটিল ; জটিলতাকে ছাঁটিতে গেলে জটিলতা হয় বিকৃত। মনে হইতে পারে যে, বিরাট জনসাধারণকে সঙ্গে লইলে সে বুঝি পদে পদে "কাজে" বিলম্বই ঘটাইবে—ইহা বুদ্ধিরই শিক্ষা। কি তোমার কাজ ? স্বরাজ লাভ কি সমগ্র জনসাধারণকে ডিঙ্গাইয়া তোমারই কাজ ? এই যে সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমগ্রের জন্য এত দরদ, ইহা বুদ্ধির সম্মোহন ছাড়া আর কিছুই নয়। জনসাধারণের জন্য কিছু চাহিলে তাহা জনসাধারণকে দিয়াই চাওয়াইয়া ও করাইয়া লইতে হইবে ; তুমি থাকিতে পার সেবক মাত্র। বিচ্ছিন্ন হইয়া বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে মিলিতে পারে সচল জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়া, কাজ হাসিল করিয়া তাহাদিগকে শোষণ, রাষ্ট্রের খুদকুঁড়া সুখ-সুবিধা লাভ।

মহাত্মাজী স্বরাজের সাধনায় এই ফাঁকিবাজির স্থান রাখেন নাই। জনসাধারণই সত্য, তাহার অধিকারই সত্য, তাহার সেবক হিসাবেই তুমি-আমি সত্য। বুদ্ধির সোজা পথ-চলার নীতি বিশ্বসমস্যা সমাধানের পক্ষে অকেজো ও ভোঁতা হইয়া পড়িয়াছে। যুক্তিশাস্ত্রও দিনের পর দিন প্রগতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মহাত্মাজী এই নবীন দর্শনকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি কি, তাহা ভাল করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে উহা পূর্ণ স্বরাজ গঠনই অথবা বলা যায় যে, ইহাই হইতেছে সত্য ও অহিংসা দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি।" কর্মপদ্ধতিকে যখন পূর্ণ স্বরাজের গঠন বলা যাইতেছে, তখন কর্মপদ্ধতি হইতেছে পূর্ণ স্বরাজের পথ (means) ; কিন্তু পর মুহূর্তেই তাহাকে যখন "পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি" বলা হইল তখন কর্মপদ্ধতিই হইতেছে গন্তব্যস্থল (end)। মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতি স্বরাজের উপায়ও বটে, লক্ষ্যও বটে, পথও বটে ; এখানে পথই গন্তব্যস্থল, গন্তব্যস্থলই পথ।

প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রে সর্বপথের বুকে গন্তব্যস্থলের আস্বাদন পাইবার

জন্য ছুটিতে হইবে। অনন্ত পথও ফুরাইবে না, অনন্ত পথের বুকে গন্তব্যস্থলের আস্বাদনও নিঃশেষ হইবে না। সমগ্র বিশ্ব হইতেই শুরু করিতে হইবে আমাদের যাত্রা, বুদ্ধির দ্বারা খণ্ডিত সব টুকরাগুলির সমন্বয়ে আবার অখণ্ড জীবন্ত বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার দিকে। "We pass from the whole to the whole"—Bradley. ভাবময় সমগ্র অখণ্ড হইতেই পথ চলার শুরু, পৌঁছাইতে হইবে খণ্ডিত টুকরাগুলির সমন্বয়ে দ্বিতীয়বার গড়া সত্য বাস্তব অখণ্ড সমগ্রের বুকে। খণ্ড হইতে সমগ্রে পৌঁছিবার প্রয়াস অযৌক্তিক, বিড়ম্বনা মাত্র। প্রথম অখণ্ডই তত্ত্ব (Idea), এই অখণ্ড তত্ত্বকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অখণ্ড সৃষ্টির বাস্তবিকতায় (Reality) আস্বাদন করাই হইবে তত্ত্বের ব্যবহার। প্রথম অখণ্ড 'তত্ত্ব' এই সমুদ্রযাত্রার কর্ণধার রূপে হাল ধরিয়া থাকিবে ; এবং তাহাই আবার সত্য-অহিংসা রূপ পালের সাহায্যে প্রকৃতি-সমুদ্রের বুক চিরিয়া প্রকৃতির বুকে দ্বিতীয়বার পূর্ণ মোক্ষ রূপে জমিয়া উঠিবার জন্য অনন্তকাল ছুটিয়া চলিবে।

মানুষ প্রথম অখণ্ড "পাইয়াই" আছে ; এই পাওয়াটা তাহার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ (fact)। দ্বিতীয় অখণ্ড তাহাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাইতে হইবে ; ইহাই তাহার সাধ্য (task)। আমরা "মানুষ" হইয়া জন্মিয়াছি ইহা যেমন স্বতঃসিদ্ধ (fact), আবার "মানুষ" হইতেও হইবে ইহাও তেমনি সাধ্য (task)। স্বরূপতঃ (in essence) যে যাহা নয়, সে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে কখনও তাহা হইতে পারে না। স্বরূপতঃ যে "মানুষ", তাহাকেই "মানুষ" করা যাইতে পারে। তেমনি স্বরূপতঃ যে অখণ্ড, তাহারই শুধু খণ্ডের বুকে অখণ্ড হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অখণ্ডের দিকে খণ্ড রওয়ানা হইলে তাহার 'শূন্যে' পরিণত হওয়া ছাড়া গতি নাই। অখণ্ডই অখণ্ডকে পায়। দ্বিতীয় অখণ্ডের বুকেই প্রথম অখণ্ড বাস্তব (real), নচেৎ নিছক ভাবুকতা মাত্র।

স্থিতিপ্রধান ভারতবর্ষের বুকে এই ঐতিহাসিক যুগে সর্বপ্রথম ভগবান্ বুদ্ধ আনিলেন গতিপ্রধান গণজাগরণ। তিনিই বেদ ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় স্থিতিমূলক সংস্কারসমূহকে ভাঙ্গিয়া গতিপ্রধান ধর্মজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন গড়িবার আন্দোলন প্রবর্তন করিলেন। ঈশ্বর থাকুন বা না-ই থাকুন, তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার অবসর তাঁহার ছিল না। বিশ্ব আছে, মানুষ আছে, তাহার কর্ম আছে—এই সোজা সরল প্রত্যক্ষ সত্যগুলির ভিত্তিতেই তিনি গণ-আন্দোলন প্রবর্তন করিলেন। বিশ্ব যখন আছে, মানুষ যখন আছে, তখন সঙ্ঘ ছাড়া মানুষের চলিবে না, অতএব সঙ্ঘও থাকিতে বাধ্য। তিনিই সর্বপ্রথম কর্মকে গৌরব দান করিলেন, কর্মের সামনে মস্তক অবনত করিলেন— "নরস্তৎকর্মেভ্যঃ নমঃ"। তিনিই সঙ্ঘ গড়িয়া বলিলেন—"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"। সর্বপ্রথম এ দেশে সঙ্ঘের সূত্রপাত হইল।

কিন্তু সনাতন ভারত বলিল—"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় তো নাস্তিক।" বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা এ দেশ হইতে নির্বাসিত হইল। বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধরাষ্ট্র গতিবেগকে বুকে লইয়াই জনগণের মধ্যে প্লাবন আনিয়াছিল, ছোটরা ইহার পতাকাতলে আসিয়া ভিড় করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের একটি ত্রুটী ছিল যে, উহা সনাতন চিন্তাধারাকে গতির রূপে রূপান্তরিত না করিয়া, উহার সহিত যোগ-সূত্র না রাখিয়া একেবারে স্বতন্ত্ররূপেই আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়াছিল। ফলে সনাতন ধারা যেমন তেমনই রহিয়া গেল, অথচ উহার উপরই ছিল ভারতবর্ষ গঠিত। বাহির হইতে আঘাত হানিতে গিয়া বৌদ্ধদর্শন বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল। বৌদ্ধপ্লাবন যদিও সমাজের অগণিত নিপীড়িতের দলকে টানিয়া বাহিরে আনিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু সনাতন কাঠামো না বদলাইবার ফলে যাহারা বাহিরে আসিল তাহারা

বাহিরেই রহিয়া গেল, যাহারা সনাতন কাঠামো আঁকড়াইয়া ছিল, তাহারা সনাতনই রহিয়া গেল। সনাতন ও নবীনের মধ্যে কোনও হৃদয়ের সংযোগ স্থাপিত হইল না, গতির মধ্যে স্থিতি নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিল না।

এইভাবে বৌদ্ধপ্রভাব ব্যর্থ হইবার পরে আসিয়াছিল ইসলাম সংস্কৃতি ও মুস্লিমরাজ। ইসলামের গতিবেগকে স্থিতির মধ্যে হজম করিয়া সমাজকে গতিপ্রধান করিবার জন্য তখন আসিয়াছিলেন নানক কবির তুলসীদাস গৌরাঙ্গ প্রভৃতি নরসিংহের দল। ইসলামের সঙ্ঘবদ্ধ নমাজ ও ভোজন হিন্দুসমাজে রূপ নিল সঙ্ঘবদ্ধ কীর্তন ও মহোৎসবে। তাহাকেও সনাতন সমাজ দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল; কেন না তাঁহারাও মূল স্থাণু কাঠামোকে বদলাইবার দিকে আদৌ কোনও ধ্যান দেন নাই। তাঁহাদের সব আন্দোলন আসিল বাহির হইতে, রহিয়াও গেল বাহিরেই। ভারতের স্থিতিপ্রধান অন্তর ইহাতেও সাড়া দিল না। যদিও গৌরসুন্দর মায়াবাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বলিয়াছিলেন, "মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী। ব্রহ্মআত্মাচৈতন্য বলে নিরবধি॥" তথাপি দার্শনিক চিন্তাধারা অপরিবর্তিত থাকায় মায়া-বাদের সিদ্ধান্তকেই প্রকারান্তরে বৈষ্ণব সমাজ বরণ করিয়া লইলেন। ব্রহ্ম-আত্মা-চৈতন্য হইতেছে বুদ্ধিমানদের প্রিয় চিন্তাপ্রণালীর দ্যোতক ব্রহ্মবাচক শব্দমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ব্রহ্ম-মায়ার, আত্মা-অনাত্মার, চৈতন্য-অচৈতন্যের সমন্বয়মূর্তি। বুদ্ধিমানের দল মায়া, অনাত্মা ও জড়কে রাখিয়াছেন ব্রহ্মস্পর্শ হইতে একেবারে দূরে সরাইয়া। তাই একান্ত ব্রহ্মবাদী, আত্মবাদী ও চৈতন্যবাদী শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী হইয়া একান্ত আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুর্জোয়া ছাড়া বিশেষ আর কিছুই নন।

বৈষ্ণবদর্শন ও গণজীবন যখন স্থিতিপ্রধান সমাজের বুকে স্থায়ী প্রাণস্পন্দন তুলিতে পারিল না, তখন আসিল সর্বক্ষেত্রে অধিকতর গতিবেগ লইয়া পাশ্চাত্যের জড়বাদ। সেই সময় রাজা রামমোহন

প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের দান অতুলনীয়। তাঁহারাও প্রয়াস পাইয়াছিলেন গণজীবনকে ভারতের ইস্পাত-কাঠামোর মধ্যে সঞ্চারিত করিতে। বর্তমান যুগ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই গণজীবনেরই প্রচার করিলেন। তাঁহাদের অজস্র লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে নিপীড়িতদের বুকভাঙ্গা বেদনার চিত্র ও তাহার প্রতিকারের ইঙ্গিত। ছোটদের অন্তরেও যে নারায়ণ নিদ্রিত, সেই নারায়ণকে জাগ্রত করাই যে সমাজের সাধনা, ছোটদের জীবন-ইতিহাসও যে বিশ্বদরবারে গৌরবময় স্থান পাইবার যোগ্য, ইহাই তো তাঁহাদের সব লেখার ভিতর দিয়া প্রকট হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক জীবনের আলোড়নও এই সময়ে স্থাণু সমাজকে কর্মের দিকে, সঙ্ঘের দিকে আগাইয়া দিতে প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু স্থিতিপ্রধান সমাজ ইহাতে টলিয়াও টলিল না। প্রবর্তকদের সব কিছু প্রচেষ্টা ও সাহিত্য যেন লাইব্রেরী ও রেস্টুরেণ্টে আলোচনার বিষয়রূপেই নিবদ্ধ রহিল। স্বামীজীর ধাক্কায়ও এ জাতি বেশী দূর কর্মের পথে অগ্রসর হয় নাই।

এমনকি বর্তমানে মহাত্মাজীপ্রদত্ত কর্মপদ্ধতিও তেমনভাবে স্থিতিপ্রধান ভারত কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। এ দেশ মুক্তিও চায়, বিপ্লবও চায়, চায় না কেবল গঠনমূলক কর্মপন্থা। এখানের ধারণা, গঠনমূলক কর্মপন্থার সহিত বিপ্লবের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তো নাই-ই, বরং বিরোধই আছে। কর্মবর্জিত জ্ঞানের বিপ্লবে, কর্মবর্জিত প্রেমের বিপ্লবে অভ্যস্ত জাতি ধরিতেই পারিল না মুক্তিসাধনায় কর্মের স্থান কোথায়! মুক্তির সঙ্গে কর্মপদ্ধতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ না থাকিলে বিপ্লব যে জনসাধারণের হয় না, ক্রমাগত পুষ্টির অভাবে ধীরে ধীরে শুকাইয়াই যায়, উহা যে কয়েকজন বুদ্ধিমানের হাতেই থাকিয়া যায়, ঐ বিপ্লব যে জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ স্পর্শ না রাখিয়া উহাদের বাহিরে আকাশেই রহিয়া যায়, এবং শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে, উহাতে যে মুষ্টিমেয়েরই কায়েমী স্বার্থ (vested

interest) সিদ্ধ হয়, ইহা কর্মকুণ্ঠ বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিতে ধরাই পড়ে না।

কর্ম ছাড়া বিপ্লব ভাবুকের ভাববিলাস। কর্মহীন বিপ্লব দাঁড়ায় না, বিপ্লবহীন কর্মও সার্থক হয় না। ইহা ঠিক যে, কর্ম ও বিপ্লবের মাঝে পরস্পরস্পর্ধিত্ব রহিয়াছে, কর্ম বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কেন না কর্মের ক্ষেত্র সর্বদাই পরিচ্ছিন্ন, পক্ষান্তরে বিপ্লবের ক্ষেত্র অপরিচ্ছিন্ন। আপাতদৃষ্টিতে পরিচ্ছিন্ন তো নিশ্চয়ই অপরিচ্ছিন্নের পক্ষে অন্তরায়। তথাপি এ কথাও সত্য যে, বিপ্লবের পিছনে কর্মপদ্ধতি না থাকিলে সে বিপ্লব মানুষকে ঘরছাড়া করিবে, উজাড় করিবে, শূন্যবাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অথচ যুক্তি ও অভিজ্ঞতা আজ সপ্রমাণ করিয়াছে যে, কর্মের বাধা মানুষের জীবনে এমন একটা পিছুটানের সৃষ্টি করে যাহা মানুষকে ঘরমুখো করে, ঘরের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দেয়, মানুষকে স্বধামস্থ হইবার পথ সুগম করিয়া দেয়। বাধার এই সহজ রূপ যাহার চোখে ধরা পড়ে সে বাধাকে ভয় করে না, বাধা ও কর্ম দুইকেই তখন তাহার সহজ জীবনের অনুকূল বলিয়া প্রাণ খুলিয়া বরণ করে। বাধাকে বাধা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেই বাধা হয় বাধা। কিন্তু কর্মার্পণের ভিতর দিয়া সেই বাধাই রূপান্তরিত হইয়া বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করে। বাধাহীন, কর্মহীন বিপ্লব বিশৃঙ্খল ভাববিলাস মাত্র। বুদ্ধির এই বিলাসিতা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই মহাত্মাজী রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে কর্মপদ্ধতিকে জুড়িয়া দিয়াছেন।

সকলের সব গণজাগরণের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে পারিল তাহার কারণ এই যে, কেহই এ পর্যন্ত দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর সাহায্যে সনাতন চিন্তাপ্রণালীকে হজম করিবার দিকে যত্নশীল হন নাই। "Without a philosophical revolution no social revolution is possible"—M. N. Roy. জড়বাদের সিদ্ধান্ত ও গীতার কর্মযোগের সিদ্ধান্ত আমরা মানিয়া লইয়াছি

বটে, কিন্তু যে যুক্তিপ্রণালীর সাহায্যে জড়ের স্বয়ং-মর্যাদা, কর্মের পারমার্থিক রূপ স্থাপিত হওয়া সম্ভব, তাহা জনসাধারণকে না শিখানো পর্যন্ত কি উহাকে মানাই হয়, না, উহা কার্যকরীই হয়? বুদ্ধিমানগণ প্রশ্ন করেন, "জনসাধারণ কি ধার ধারে চিন্তাপ্রণালীর? তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্রের কচকচির মধ্যে টানাটানি করিয়া কি সুফল ফলিবে?" এ কথা যুক্তিসহ নয়। প্রথমতঃ, জনসাধারণ মোটেই বিচারশক্তিবিহীন নয়। তাহারা সহজ বুদ্ধিতে অনেক কিছু বোঝে। জনসাধারণ আইনের খবরও খুব কম রাখে না, কর্মবর্জিত বিপ্লবের অনুকূল যুক্তি তাহাদের সহজ বুদ্ধিতে বেশ জানা আছে। গ্রামের একজন নিরক্ষর চাষীকেও ভীষণ মামলাবাজ হইতে দেখা গিয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ একজন নিরক্ষর কৃষকও "জগৎ মিথ্যা"-বাদের পক্ষের যুক্তি সুন্দরভাবে উপস্থিত করিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যখন যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় তাহার পিছনে একটা সুসংবদ্ধ চিন্তাপ্রণালী নিশ্চয়ই আছে; সিদ্ধান্ত তো আকাশ হইতে টপকাইয়া পড়ে না। সিদ্ধান্ত দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়াই স্থাপিত হয়।

এসেম্ব্লীতে আইন পাশ হয়, তাহাও কি বহু আলোচনারই ফল নয়? জনসাধারণ ততখানি না জানিতে পারে, কিন্তু তাহা জানিবার ও জানাইবার ও তাহার প্রয়োগকৌশল শিখাইবার মত একদল আইনজ্ঞ পুরুষ তো আছেনই। বর্তমান ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। জনসাধারণ সাহিত্য, সঙ্গীত, কথকতা ও প্রবাদবাক্যের ভিতর দিয়া একটা সিদ্ধান্ত শিখিয়াছে এবং সেই সিদ্ধান্তস্থাপনের অনুকূল যুক্তিও আচার্যদের মারফত শুনিয়াছে ও সহজ বুদ্ধিসাহায্যে আয়ত্ত করিয়াছে। আজ যে এই জাতি মায়াবাদী, সে যে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" প্রভৃতি সিদ্ধান্ত শিখিয়াছে, তাহার পিছনে কি একটা প্রকাণ্ড আন্দোলন ছিল না? আজ যেটা জলের মত সহজ, তাহাকে সহজ করিতে অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হইয়াছে। ইউক্লিডের সিদ্ধান্ত সহজে স্থাপিত হয় নাই, এখন উহা অবশ্য সহজই হইয়াছে। আইনস্টিনের জ্যামিতি

এখনও জটিল ; তাহাও একদিন সহজ হইবে। কিন্তু সব সময়েই সিদ্ধান্তের পিছু পিছু একটা চিন্তাপ্রণালী আছেই, যাহাকে হয় সাক্ষাৎভাবে, নয় তো গ্রন্থরচনার ভিতর দিয়া পরোক্ষভাবে পণ্ডিতদের মারফত সমাজশরীরে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তিবিশেষ আজ আর তাহাদিগকে এই মতবাদ ও চিন্তাপ্রণালী শেখায় না, শিখাইতেছে ঐ ঐ সিদ্ধান্ত ও চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা গঠিত অনুপ্রাণিত এই ইস্পাতের কাঠামো। এই আবেষ্টনের মধ্যে খাইয়া-দাইয়া ও চলিতে ফিরিতে থাকিয়া হাওয়ার মধ্য হইতেই সে এই মতবাদ শিখিতেছে, আজ আর কাহারও বলিবার প্রয়োজনই নাই। মায়াবাদের তৈয়ারী দার্শনিক আবেষ্টনই আজ সনাতনত্বকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে ও রাখিবে।

বুদ্ধদেব হইতে মহাত্মাজীর কংগ্রেস পর্যন্ত প্রাণপণ ধাক্কাধাক্কি করিয়াও অস্পৃশ্যতা-বর্জনের পথে জাতিকে এক পাও অগ্রসর করাইতে পারেন নাই বলা চলে। শহরের হোটেল রেস্টুরেণ্টে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিশেষে ভোজনপান দেখিয়া যাহারা মনে করিতেছেন যে অস্পৃশ্যতা-বর্জনে এ জাতি খুব অগ্রসর হইয়াছে, তাঁহারা ভ্রান্ত। সনাতনীদের কেন্দ্রে গিয়া যখন দেখিবেন যে, ব্রাহ্মণপুত্রের উপনয়নের নিমন্ত্রণসভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্য দিয়া কায়স্থ কুলীন সমাজের শীর্ষস্থানীয় সুশিক্ষিত সদাচারসম্পন্ন কোনও বিশিষ্ট পুরুষের জল পরিবেশন করাটুকুও সমাজে চালু হয় নাই, তখন কি বলা যুক্তিযুক্ত হইবে যে, এ জাতির অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলন এতটুকুও আগাইয়াছে ? সনাতনীরা বেশ জানেন যে, এ আন্দোলনও পূর্বেকার মতই দুই দিনের হৈ চৈ-তে পরিণত হইবে, তাহাদের সনাতন কাঠামোর গায়ে যখন সামান্য আঘাতটুকুও লাগিতেছে না।

জড়ের বুকে অজড়ের প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভবপর হয়, যখন জড় হয় নমনধর্মশীল (flexible)। জড়ের এই নমনধর্মশীল স্বরূপের খবর বর্তমান বিজ্ঞান আইনস্টিনের ভিতর দিয়া বিশ্বদরবারে পৌঁছাইয়াছে।

নিউটনের জড় ছিল মৃত (dead), অকর্মণ্য (inert), নিরেট (block) ; কাজেই অজড়ের সঙ্গে তাহার সমন্বয় ছিল অসম্ভব। জড়ের নমনধর্ম সম্ভব হইলে অজড় আর ভূমিহীন ভূপতির মত জড়ের বাহিরে থাকিয়া ভাববিলাসীর বিষয়বস্তুরূপে ভিত্তিহীন অবস্থায় আকাশে থাকিত না। বুদ্ধি যাহার বিশ্বসেবায় অর্পিত, তাহার সেই কল্যাণী বুদ্ধিই জড়ের নমনধর্মশীল স্বভাবের খোঁজ পাইতে পারে। মড়াকাটা-নীতি দ্বারা বুদ্ধি অনন্তকালেও জড়কে 'মড়া' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিবে না। বিশ্বরূপার্পিত বুদ্ধিকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিলে জনসাধারণও জড়ের দিব্য ভাগবতরূপের খোঁজ পাইবে, আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া যমুনা উজান বহিত, পৃথিবী পুলকিত হইত, জড়ে অজড়ের ধর্ম ফুটিয়া উঠিত—ইত্যাদি মহাসত্য-প্রচারের মধ্য দিয়া জড়ের অজড় স্বভাবের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু এই বাঁশীর গানে বিশ্বকে 'অজড়' বলিয়াই আস্বাদন করিয়াছেন। তাই বৈষ্ণব সাধনায় রজের (ধূলির) এত মহিমা। বৈষ্ণবসাধনায় বিশ্বের ধূলিকণাও জীবন্ত।

কেন্দ্র ও পরিধি

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন গোরা জগতে ফেলিল ঢালি। কাঙ্গালে পাইয়ে খাইয়ে মাতায়ে বাজাইয়ে করতালি।" অজড় লোকের যে 'ধন' ছিল ভব-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতাদের একচেটিয়া সম্পদ, যাহাকে পাইতে হইলে তাঁহাদের আরাধনা ব্যতীত অন্য কোনও পথে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, যে 'ধন' পাইতে হইলে দারাপত্য, জীবন-যৌবন সব-কিছু ত্যাগ করিয়া অজড় লোকের পানে ছুটিতেই হইবে, সেই ধনকেই দুঃসাহসিক গোরা নোংরা জগতের নোংরা সাংসারিক মানুষদের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন সকলেরই সাক্ষাৎ ভাবে (কোনও বুর্জোয়া মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মারফতে নয়), সেই 'ধন' পাইবার পথের সকল অন্তরায় মুছিয়া ফেলিলেন। "নগণ্যতম" পুরুষও যে আজ এই লোকে থাকিয়াই এই ধন লাভের অধিকারী—ইহা সর্ব শাস্ত্র ও যুক্তি সহায়ে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এখানেও বুদ্ধি বাদ সাধিতে পারে। সেই জন্য অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের গণ-আন্দোলনকে রাষ্ট্রক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কোনও ক্ষেত্রে আসিয়াছে জন-জাগরণ, অথচ জীবনের অপর ক্ষেত্রে রহিয়াছে মুষ্টিমেয়ের দ্বারা প্রবর্তিত রাষ্ট্রসমাজ ব্যবস্থা, এই অবস্থায় উভয় পক্ষের টানাটানির ফলে অগ্রগতি ব্যাহত হইবেই। তাই তো আজ ধর্মক্ষেত্রের জন-জাগরণ সার্থক হইতে চায় রাষ্ট্রক্ষেত্রের জন-জাগরণে। মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা এইখানে অভাবনীয় নূতনতম। যে কংগ্রেস ছিল এতদিন বড়-লোকের, সেই কংগ্রেসকে মহাত্মাজী বিলাইয়া দিলেন জনসাধারণের মাঝে। চেয়ার টেবিলের কংগ্রেস আজ দূর্বাসনের বুকে, উচ্চ বর্ণের গা ঘেঁসিয়া যেখানে বসিয়াছে এতদিনের অস্পৃশ্যদের দল। মুষ্টিমেয়ের

সাধ্য বিপ্লব আজ জনসাধারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত। কংগ্রেসের মহাশক্তির "উৎস" ভারতের জনসাধারণ। মহাত্মাজী বলিতেছেন—"আমরা অনেক দিন ধরিয়াই ইহা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে, শাসন-পরিষদই হইতেছে ক্ষমতার উৎস। আমি তো এই কথাই জানিয়া থাকি যে, ঐ প্রকার চিন্তা করা বিষম ভ্রম। উহা গতানুগতিক অথবা সম্মোহনেরই ফল। বৃটিশ ইতিহাস ভাসাভাসা ভাবে পড়িবার ফলে আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি যে, সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেণ্ট হইতে উৎপন্ন হইয়া জনসাধারণে পৌঁছাইয়া থাকে। কিন্তু সত্য কথাটি এই যে, ক্ষমতার অধিষ্ঠান স্থান হইতেছে জনসাধারণ, এবং জনসাধারণ যে সময়ে যাহাকে প্রতিনিধি করে, ক্ষমতা তখন তাহার হাতেই বর্তায়। জনসাধারণকে বাদ দিয়া পার্লামেণ্টের কোনও ক্ষমতাই নাই, এমনকি উহার অস্তিত্বই নাই। গত একুশ বৎসর ধরিয়া এই সহজ কথাটি আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আইন অমান্য হইতেছে তাহার ভাণ্ডার ঘর। মনে করুন যে, সমস্ত লোকই আইনসভায় পাশ-করা কোনও আইন পালন করিতে অনিচ্ছুক এবং আইন না-মানার জন্য যে শাস্তি হউক তাহা লইতে তাহারা প্রস্তুত। এইরূপ অবস্থায় তাহারা সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনযন্ত্রকে অচল করিয়া ফেলিবে। মিলিটারী বা পুলিশী শক্তি সংখ্যালঘু দলকে, সেই দল যতই শক্তিশালী হউক না কেন, বাধ্য বা বশীভূত করিতে পারে। কোনও মিলিটারী বা পুলিশী শক্তি একটা সমগ্র জনসাধারণের দৃঢ়সংকল্পকে বলপূর্বক বাধ্য বা বশীভূত করিতে পারে না, যদি তাহারা সমস্ত নির্যাতন শেষ পর্যন্ত সহ্য করা স্থির করে।"

মহাত্মাজী এই "সোজা কথাটা" তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ভিতর দিয়া জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাহারা কিন্তু সোজা কথাটা সহজে বোঝে নাই, সহজে বুঝিবেও না। মহাত্মাজীর কাছে ইহা 'সহজ' বটে; কিন্তু এতদিনকার দর্শনশাস্ত্র ও চিন্তাপ্রণালীর ভিতর দিয়া যে প্রচেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে

সহজ কথাটাই আজ জটিল হইয়াছে এবং বুদ্ধির সম্মোহনের ফলে এবং বহু দিনের সংস্কারের ফলে জটিলই আজ সকলের কাছে সহজ ও রোচক হইয়াছে। ক্ষমতার "উৎস" যে ঐ শাসন-পরিষদ, এবং উহাকে ছিনাইয়া আনিয়া দখল করিতে পারিলেই যে সব ক্ষমতা হাতে আসিয়া পড়ে, ইহাই তো ছিল বুদ্ধির কাছে খুব সহজ। বুদ্ধির গতানুগতিকতা ও সম্মোহনের ফলে সহজটাই হইয়াছে আজ জটিল, জটিলটাই সহজ। সহজ কথাটা সহজে কেন যে বুঝিয়া উঠা বা কার্যে পরিণত করা যায় না, এইবার আমরা তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করিব।

সহজটাকে সহজে না বুঝিবার মূলেও রহিয়াছে একটা দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর উপর গড়া কাঠামোর (Psychological mechanism) প্রভাব ও সম্মোহন। বুদ্ধি স্বভাবতঃই জোর দেয় বৃত্তস্থ (circle) কেন্দ্রের (centre) উপর ; পরিধি (circumference) তাহার বিচারে কেন্দ্রের বাহিরে, দূরে ; কেন্দ্র হইতে পৃথক্। সমস্ত পরিধি এই কেন্দ্রকে ধরিয়াই টিকিয়া আছে। কেন্দ্রচ্যুত হইলেই পরিধি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। পরিধির 'বহু' অংশ একটি মাত্র কেন্দ্রেই সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ। বুদ্ধির দৃষ্টি সর্বদাই একের দিকে, কেন্দ্রের দিকে ; তাহার কৃতিত্ব হইতেছে সব বহুকে, বহুর সব জটিলতাকে সহজ পথ-চলার নীতি দ্বারা ছাঁটিয়া ফেলিয়া সহজ পথ তৈয়ার করিয়া লওয়ায়। একান্ত বুদ্ধি চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয় যখন সে মনে করে যে ঝঞ্ঝাট এড়াইলেই ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায়। ঝঞ্ঝাটও যে সৃষ্টি-রচনার একটি কৌশল, ঝঞ্ঝাটহীন সৃষ্টি যে হয়ই না—এই সহজ সরল সত্য কথাটা বুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে নাই। বুদ্ধি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার সময় প্রাণের সহযোগিতা লইত, তবে ইহা বুঝিতে তাহার বেগ পাইতে হইত না ; কিন্তু বুদ্ধি তো অহং-প্রাথমিকতার ধ্যানে মশগুল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৈনিকশক্তি দ্বারা সব ঝঞ্ঝাটের সহজ সমাধান করিয়া স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা

বুদ্ধিরই short-cut নীতির ফল। বুদ্ধির বিশ্লেষণের ফলে ঝঞ্ঝাট আপাততঃ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেও আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকে। কেন্দ্রীয় সৈনিকশক্তি (militarism) পরিধির কণ্ঠ চাপিয়া রাখিয়া সহজে গদী দখল করিবার ও দখলে রাখিবার কল্পনাই করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কি দেখিয়াছে যে চোরাকারবারীদের মত পরিধির সেই চাপা শক্তিই গোপন প্রদেশে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, যাহা একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া সব শাসনযন্ত্রকে অচল করিবে, শাসনযন্ত্র কাড়িয়া লইবে?

বার বার এইভাবে গদি দখল ও হাতছাড়া হইবার ভিতর যে বুদ্ধির ও যুক্তিপ্রণালীর দৈন্য রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্যই মহাত্মাজীর এই অভিনব, আপাতদৃষ্টিতে জটিলতাময় অথচ সবচেয়ে সহজ রাষ্ট্রসাধনার প্রবর্তন। সৈনিকদল যে-পরিধিকে পিছনে রাখিয়া এবং যে-কেন্দ্রকে সামনে রাখিয়া শক্তি লাভের জন্য আগাইয়া চলিল, সেই দুই দলকেই জনসাধারণের ভিতর সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সেখান হইতে যাত্রা শুরু করাই মহাত্মাজীর এই কর্মপদ্ধতির গৌরব। এই কর্মপদ্ধতি জটিলতাকে সৃষ্টির সত্য একটি কৌশল ধরিয়াই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধি পরিধির জটিলতাকে ছাঁটিয়া কেন্দ্রাভিমুখী দৃষ্টির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। বুদ্ধি সব সময়েই কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের দিকে তাকাইয়া থাকিতে প্রেরণা দেয়। এইভাবে শহর স্থাপিত হয় কেন্দ্রে, গ্রামগুলি পড়িয়া থাকে পরিধিতে অবজ্ঞাত অবস্থায়। পরিধির বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলিকে সমগ্র ভাবে না দেখিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেখিলে প্রতি টুকরার কাছে কেন্দ্রই শক্তির উৎস হইয়া দাঁড়ায় নিশ্চয়ই। পরিধির প্রতিটি অংশকে তখন শক্তি লাভের জন্য অন্য সকলকে পিছনে ফেলিয়া প্রতিস্পর্ধিতার হুড়াহুড়ির মধ্য দিয়া কেন্দ্রের দিকে ছুটিতে হইবেই। ক্ষমতা যাহার দৃষ্টিতে রহিয়াছে কেন্দ্রে, তাহার পক্ষে পারস্পরিক নির্ভরতার অবকাশই থাকে না। এইজন্যই কেন্দ্রে পৌঁছিতে হইলে কাহারও পক্ষে

পরিধিস্থ অন্য কাহারও প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবার আদৌ প্রয়োজন নাই ; প্রয়োজন শুধু তাহার কেন্দ্রের মহিমা কীর্তন ও স্তবস্তুতি বা তোয়াজ। এই মিথ্যা স্তবস্তুতি বুদ্ধিরই কারসাজি ; এবং ইহাতেই অন্যের বুদ্ধি সম্মোহিত হয়। গ্রাম শোষণ করিয়া শহর সৃষ্টির রহস্যও এইখানেই। পরিধিস্থ গ্রামগুলি হইয়াছে "অন্তঃসারশূন্য জ্যোতিহীন" ; শহর দিনের পর দিন গ্রামের রক্ত পান করিয়া মোটা তাজা। বুদ্ধিশাস্ত্র রওয়ানা হইয়াছে ব্যষ্টিজীবন হইতে ; তাই শহর তাহার সামনের ধ্রুবতারা ; গ্রাম থাকিয়া যায় পশ্চাতে, শহরের বাহিরে অস্পৃশ্যরূপে। তাহাদের কাছে শহরই কেন্দ্র, গ্রাম হইতেছে পরিধি ; এবং এই দুইটি পরস্পর-প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু এইভাবে পরিধিস্থ গ্রামের প্রতিটি ব্যষ্টি মানুষ যদি শক্তির লোভে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসে, তবে যে তাহার ব্যষ্টি সত্তারই নির্বাণ হইবে এবং ব্যষ্টি সত্তার নির্বাণে সমগ্র পরিধিরই নির্বাণ হইবে তাহা বুদ্ধির কাছে ধরা দেয় নাই ; ধরা পড়িলেও বুদ্ধির পক্ষে এই পথ ছাড়া অন্য পথও নাই। কোনও একটি ব্যষ্টি মানুষ যে 'কেন্দ্র'কে ধরিয়া তাহার সত্তা-চৈতন্য-আনন্দের পরিপূর্ণ আস্বাদনে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হইবে না, ইহা আজ বুদ্ধির এই ক্রমাগত ব্যর্থতার ভিতর দিয়া বুদ্ধির কাছেই ধরা দিয়াছে।

বুদ্ধি আজ আর এক স্তর উপরে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। সেই স্তরের বুদ্ধিই গীতার বুদ্ধিযোগ ; "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ"। এই 'পরাবুদ্ধির' কাছে প্রতিভাত হইতেছে যে, পরিধির অংশগুলি যদি পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বুকে বুক মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তবে কোনও একটি বিশেষকেই কেন্দ্রের কাছে নিভিয়া যাইতে হয় না, পরন্তু এই সঙ্ঘবদ্ধ পরিধির টানে কেন্দ্রই কেন্দ্রচ্যুত হইয়া হজম হইয়া যায় পরিধির মধ্যে, পরিধির বুকে। বিজ্ঞানক্ষেত্রেও এই মহান্ সত্য আসিয়া পড়িয়াছে। যে মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) ছিল বিশ্বের কেন্দ্রে, সেই মাধ্যা-কর্ষণকে মহামতি আইনস্টিন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও যুক্তিদ্বারা স্থাপন

করিয়াছেন পরিধিস্থ অংশসমূহের পারস্পরিক নির্ভরতা ও হৃদয়ের সংযোগবিধানের মধ্যে। পরিধিস্থ গ্রামগুলি যদি পরস্পর পরস্পরকে প্রতিবেশীর চোখে দেখে এবং "প্রতিবেশীকে ভালবাস (Love thy neighbours)"—যীশুর এই মহাবাণীকে যদি অক্ষরে অক্ষরে কার্যক্ষেত্রে পরিণত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলে, তখন দেখা যাইবে যে কেন্দ্রই ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছে, কেন্দ্রের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য ও জ্যোতিঃ সব পরিধিতে ফিরিয়া যাইতেছে।

তত্ত্বহিসাবে কেন্দ্রকে হজম করাই পরিধির চরম ও পরম সাধ্য; কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রে কেন্দ্রকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা কোনও দিনই কোনও রকমে সম্ভব হইবে না। কেন্দ্রস্থ শহরকে হজম করিবার দিকে থাকিবে শুধু পরিধিস্থ গ্রামগুলির দৃষ্টি ও সাধনা। এই সাধনা অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে। কেন্দ্রকে হজম করিয়া পরিধিরই কেন্দ্র বনিয়া যাইবার প্রচেষ্টার ফাঁক দিয়া "ভারত ছাড়" (Quit India) কংগ্রেসের এই নির্দেশবাণী আপনা আপনি বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। শহরের কেন্দ্র নাই; কেন্দ্র রহিয়াছে পরিধিস্থ প্রতিবেশী অংশসমূহের হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য সংযোগের ভিতর—এই তত্ত্বদৃষ্টিই হইতেছে গঠন-মূলক কর্মপদ্ধতির প্রাণ। শহর শহরে নাই; শহরকে খুঁজিতে হইবে প্রতিবেশী গ্রামসমূহের অবিচ্ছেদ্য হৃদয়সংযোগের ভিতর—এই তত্ত্বটি আজ দেশকর্মীদের জপমন্ত্র করিতে হইবে। গ্রামগুলি সংগঠিত হইলে শহর আসিয়া "দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্"—বলিয়া গ্রামের শরণাগত হইবে। "গ্রামবাসীর ভারতবর্ষ তো তাহার কাছেই, গ্রামের মধ্যেই নিহিত"।

পরিধির প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অংশ অর্থাৎ গ্রাম যখন স্বয়ংপূর্ণ এবং স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ংশাসিত, সেই গ্রামগুলি যতখানি সুসংবদ্ধ, কেন্দ্রীয় কুহক ততখানিই নিরস্ত। কেন্দ্রের বিকেন্দ্রীকরণের দিকেই সব গণ-আন্দোলনের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা চাই, এবং রওয়ানাও হইতে হইবে পরিধির সঙ্গে একীভূত হইয়াই। পরিধিকে পিছনে রাখিয়া, গ্রামকে

পিছনে রাখিয়া শহরের সঙ্গে, কেন্দ্রের সঙ্গে হিংসা ও অসত্যের হুড়াহুড়িতে জাতির যে শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়, তাহা জাতির পক্ষে অপূরণীয়। কেন্দ্রই যখন সৃষ্টি হইয়াছে বুদ্ধি-কুহকের ভিতর দিয়া, তখন সেই কুহকের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই ব্যর্থ হইবেই। বুদ্ধি-কুহকের সঙ্গে লড়াই সার্থক হইবে যদি হৃদয়ের সংযোগের ভিতর বুদ্ধি হজম হইয়া যায়। যিনি বিশ্বরূপ, বুদ্ধি ও প্রাণের সমন্বয়ের ভিতর দিয়া যিনি কেন্দ্রে ও পরিধিতে সমান রূপে বিরাজ করিতে পারেন, তিনিই মদনমোহন। বিশ্বরূপই মদনমোহন। একান্ত কেন্দ্রও মদন, একান্ত পরিধিও মদন, কেন্দ্র ও পরিধির শক্তি লইয়া কাড়াকাড়িও মদন। এই মদন মোহিত হয় তাহারই শ্রীচরণতলে, যিনি তত্ত্ব-দৃষ্টিতে কেন্দ্র ও পরিধির সমন্বয় দেখিয়াছেন, এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কখনও বা কেন্দ্রের দিকে পরিধির, কখনও বা পরিধির দিকে কেন্দ্রের অনুগমন করিবার কৌশল নিজে আস্বাদন করিয়া আস্বাদনের জন্য বিশ্বদরবারে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিশ্বরূপই মদনমোহন। সর্বগ্রামসমন্বয়ই বিশ্বরূপ ; সেখানেই মদনমোহনের সাক্ষাৎ প্রকাশ। বিশ্বরূপের ধ্যানেই গ্রামগুলি বৃন্দাবনের শোভায় ভরপূর হইবে। গোড়ায় শ্রম ও বুদ্ধির মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ার ফলেই গ্রাম গিয়াছে শুকাইয়া, গ্রামের রক্ত পান করিয়া শহর হইয়াছে ক্রমান্বয়ে পুষ্ট। "শ্রমের সহিত বুদ্ধির সহযোগিতার অভাব হওয়ায় গ্রামের উপর অমার্জনীয় অবহেলা উপস্থিত হইয়াছে। সেই ভাবে সুচারু গ্রামের শোভায় দেশ শোভিত না হইয়া আমরা দেখিতেছি আঁস্তাকুড়ের সমাবেশ।" গ্রামমুখী হইবার দিন, ঘরে ফিরিবার দিন আবার আসিয়াছে।

কর্ম ও বিপ্লব

প্রতিটি মানুষ যেরূপ স্বরূপ-বিশ্বরূপ, তাহার সব ধর্ম যেমন স্বধর্ম-বিশ্বধর্ম, তাহার প্রতিটি কর্মও তদ্রূপ স্বকর্ম-বিশ্বকর্ম—এই সিদ্ধান্তের উপরই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি দাঁড় করানো হইয়াছে। কর্ম-নৈষ্কর্ম্যের ঝগড়া সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কর্ম নৈষ্কর্ম্য হয় না, নৈষ্কর্ম্যও কর্ম হয় না,—এই সিদ্ধান্তের ফলেই এ দেশে কর্মী গড়ে নাই ; এ দেশ নৈষ্কর্ম্যবাদী। নৈষ্কর্ম্যবাদই বিপ্লববাদ। পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম করিয়াও কোন্ কৌশলে সেই কর্মকে অপরিচ্ছিন্নের ক্ষেত্রে নৈষ্কর্ম্যে বা বিপ্লবে রূপায়িত করা যায়, ইহাই ছিল দর্শনশাস্ত্রের মূলগত প্রশ্ন। এতদিন সে চেষ্টা সফল হয় নাই বলিয়া এ দেশের মুক্তির উপাসক বিপ্লবীরা কর্মত্যাগের উপদেশই দিয়াছেন। তাই তো দেশ সন্ন্যাসধর্মকে বড় করিয়া দেখিয়াছে। মুক্তিকামী পুরুষকে নৈষ্কর্ম্য বা বিপ্লবের পথে কর্মকে, কর্মক্ষেত্রকে, বিষয়কে পরিত্যাগ করিতেই হইত।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্বপ্রথম গীতাশাস্ত্রে কর্ম ও বিপ্লবের সমন্বয় প্রচার করিয়া বলিলেন—"যৎ করোষি তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্"—'যাহা কিছু কর, আমাতে অর্পণ করিয়া কর।' "আগে" অর্পণ, "পরে" করা ; করার পরে অর্পণ হয় না। ভাগবত ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

'বিষ্ণুর শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ, পাদবন্দন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি যদি বিষ্ণুতে "অর্পিতা হইয়া করা যায়" (অর্পিতা এব ক্রিয়েত), তবে তাহাই উত্তম অধীত বলিয়া মনে করি।'

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের উপরিউক্ত ভক্তিসিদ্ধান্তে বিষ্ণুতে অর্পিত শ্রবণাদি কর্মই ভক্তি। 'অর্পিত' হওয়ার পরে কর্ম। আমরা কিন্তু

"করা"র পর অর্পণ করিতে চাহিতেছি। অর্পণের পর ক্রিয়া ইহাই গীতাসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের কার্যাত্মক রূপই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিতে রহিয়াছে। যে 'ভক্তি' ছিল আধ্যাত্মিকদের সাধনা, সেই সাধনাই আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মাজী প্রবর্তন করিলেন। কর্ম যখন বিশ্বরূপ ভগবানে অর্পিত, তখনই তাহা বিশ্বকর্ম, নৈষ্কর্ম্যপদবাচ্য। কর্মের অন্তর্নিহিত অর্পণাংশই নৈষ্কর্ম্য বা বিশ্ববিপ্লব। কর্মের বাহিরে, কর্মকে পদদলিত করিয়া কর্ম না-করার নাম নৈষ্কর্ম্য বা বিপ্লব নয়। কর্মের বিশ্বরূপসত্তাই বিপ্লব। বিশ্বরূপার্পিত কর্মই একাধারে কর্ম ও বিপ্লব।

কর্ম বর্তমানে অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণে জড়, মৃত (dead), তেজস্বিতার স্পর্শবর্জিত (inert), নিরেট (block)। উহাকে যখন টানিয়া কিছুতেই বিপ্লবের রূপ দেওয়া চলিবে না, তখন বিপ্লবীর কর্মত্যাগ ছাড়া গতিও নাই। বাস্তবিকই অহংবুদ্ধি লইয়া পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ও বিশ্বরূপকে সাবধানে পিছনে রাখিয়া যে কর্ম, তাহা বিপ্লববিরোধী। কর্মের এই আপেক্ষিক রূপ শক্ত 'আমি'র দৃষ্টিতেই মৃত, নিরেট। কিন্তু বুদ্ধি যাহার বিশ্বরূপায়িত, তাঁহার দৃষ্টিতে কর্ম নমনধর্মশীল, বিপ্লবের সাক্ষাৎ উপায় কিংবা বিপ্লবেরই ঘন বিগ্রহ। একান্ত অহংবুদ্ধির কর্ম যেমন বিপ্লবকে ঠেকাইয়া রাখে, পক্ষান্তরে কর্মবর্জিত একান্ত বিপ্লবও ভিত্তিহীন বস্তুতন্ত্রহীন ভাববিলাসই সৃষ্টি করে। বিপ্লব ছাড়া কর্ম জড়, মৃত; কর্ম ছাড়া বিপ্লবও বুদ্ধির বিলাসিতা মাত্র। একান্তভাবে কেহই সমগ্র বাস্তব জীবনকে স্পর্শ করিতে সক্ষম নয়। সত্য সার্থক জীবনে কর্ম ও বিপ্লবের সম প্রয়োজন রহিয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন—"ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"—'আমাতে বুদ্ধি নিবেশিত কর।' বুদ্ধি যখন বিশ্বরূপস্তরে উন্নীত হয়, তখনই জড় কর্ম হয় নমনধর্মশীল; নমনধর্মশীল জড় তখন বিশ্বরূপেরই ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠে। এই বিপ্লবের সাক্ষাৎ উপায় হইবার যোগ্যতা তখন কর্মের ভিতর হইতেই আত্মপ্রকাশ করে;

তখন কর্মই বিপ্লব বা নৈষ্কর্ম্য, নৈষ্কর্ম্য বা বিপ্লবই কর্ম। "না" যে কেমন করিয়া "হাঁ"-এর বুকে থাকে, হাঁ-এর সব কাঠিন্য গলাইয়া দিয়া তাহাকে বিশ্বরূপে রূপায়িত করিতে পারে, সেই শিক্ষাই গীতায় আগাগোড়া রহিয়াছে। সেই শিক্ষাই হইতেছে গীতার অপূর্ব দান। সেই কৌশল হইতেছে 'অর্পণ'। এই অর্পণের ভিতর দিয়াই কর্ম হয় ভজন বা সেবা। "ভজ্" ধাতুর মৌলিক অর্থ "সেবা করা"।

খাদিকর্ম

পূর্বে বলিয়াছি, সেবাবুদ্ধি থাকিলে ভজনকর্মের মধ্যে সব বিশেষ বিশেষ কর্মপন্থার সমন্বয় আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। গীতা ইহাই বলিয়াছেন—স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"—'স্বকর্ম দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করে।' এই স্বকর্মই স্বকর্ম-বিশ্বকর্মের সমন্বিত সহজ কর্ম, যাহার সূত্রপাত হয় সর্বভূতের শ্রীচরণতল হইতে তাঁহাদের সহজ সরল সেবাবুদ্ধির ভিতর দিয়া। ভাগবতও বলিতেছেন, "নৈষ্কর্ম্যলক্ষণং উবাচ চচার চ কর্ম"—'নর-নারায়ণ দেব নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ কর্ম বলিলেন ও আচরণ করিলেন। অদ্বৈত-বাদের লক্ষ্য ছিল নৈষ্কর্ম্য, কর্ম ছিল তাহার লক্ষণ; কিন্তু ভাগবত সিদ্ধান্তে কর্ম হইতেছে লক্ষ্য, নৈষ্কর্ম্য সেখানে কর্মের লক্ষণ। কর্মক্ষেত্রের স্বয়ংমূল্য দিতে হইলে কর্মকে "লক্ষ্য" রূপে রাখিতেই হইবে। অথচ নৈষ্কর্ম্য যদি সেই কর্মের লক্ষণ না হয় তবে তাহাতে কর্মক্ষেত্র লইয়া শুরু হইবে কর্মীদের হুড়াহুড়ি, কাড়াকাড়ি, যাহার ফলে সকলেরই বিপ্লব যাইবে শুকাইয়া, কর্মক্ষেত্র যাইবে অপর শক্তিমানের হাতে। তাই তো আজ ভারতে স্বাধীনতার আস্বাদনের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়াছে কর্ম-নৈষ্কর্ম্যের সমন্বয়বিধান। মহাত্মাজী কর্ম-নৈষ্কর্ম্যের সমন্বয়ের ভিত্তিতেই খাদিকর্মকে প্রচার করিয়াছেন। খাদির নৈষ্কর্ম্যস্তরের বা বিপ্লবের দিকটি না আস্বাদন করিতে পারিলে খাদি দ্বারা স্বাধীনতার আস্বাদন কিছুতেই আসিবে না। খাদি নিজের ভারেই নিজে অচল হইয়া যাইবে, নিশ্চিহ্ন হইবে।

বিপ্লব-অর্থ যদি খাদিতে থাকে তবে ইহার জন্য মানুষ অনেক কিছু ক্ষতি সহ্য করিতে পারে। তখন দামের প্রশ্ন সেখানে উঠেই না। কিন্তু বিপ্লবী মনোবৃত্তির ভিতর স্বাধীনতা আস্বাদন করিতে চাহিলে খাদির দাম সম্বন্ধেও বেশী কিছু বলিবার থাকিবে না, দাম ধীরে ধীরে

কমিতে থাকিবে। কিন্তু খাদিকে ঠিক ঠিক বিপ্লবের মূর্তি হিসাবে জনসাধারণকে বুঝানোও হয় নাই, তাহারাও বুঝে নাই। তাহারাও খাদিকে শুধু "কাপড়" হিসাবেই দেখিয়াছে। শুধু তাহারা কেন, যাহারা খাদিকর্মী তাহারাই কি খদ্দরের বিপ্লবাংশ সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁসিয়ার ? তাহাদের কাছে খাদিকর্ম পরিচ্ছিন্নই রহিয়া যাইতেছে, বিষয়ীর কর্মের মত ব্যবসায়ের বুদ্ধিই জাগাইয়া তুলিতেছে। মহাত্মাজী লিখিতেছেন—"যে কয়েকটি পদ দেওয়া হইল, ইহার কোনও একটিকে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের অঙ্গীভূত হইয়াছে বলিয়া পরিহাস করার ভুল যেন পাঠকেরা না করেন, অনেক লোক ছোট বড় অনেক কিছু কাজ স্বাধীনতা বা অহিংসার সহিত যোগযুক্ত না করিয়া তাহা করিয়া থাকে। সেগুলির প্রত্যাশিত, সীমাবদ্ধ মূল্য আছে। একই লোক যদি সাদা পোশাকে নাগরিকরূপে আসে তখন তাহার কোনও মূল্য না দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যখন সে সেনানায়ক হিসাবে আসে তখন সে একটা মস্ত লোক। তাহার হাতে লক্ষ লোকের জীবনমরণ নির্ভর করে। তেমনি এক বেচারী গরীব কাটুনীর হাতে চরখা তাহাকে এক আধ পয়সা পাওয়াইয়া দিবার যন্ত্রমাত্র, কিন্তু জওহরলালের হাতে সেই চরখাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের যন্ত্র হয়। পদই বস্তুর মর্যাদা দেয়। গঠনমূলক কর্মকেও তাহার পদই অসামান্য মর্যাদা ও শক্তি দান করিয়া থাকে। আমার তো ইহাই অভিমত। হইতে পারে ইহা পাগলের কথা ; যদি কংগ্রেসীদের নিকট ইহার কোনও মূল্য না থাকে তবে আমাকে বাতিল করিয়া দিতে হইবে। কেন না গঠনমূলক কর্ম-পদ্ধতি বাদ দিয়া আমার দ্বারা আইন অমান্য করান মানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতদ্বারা একটা চামচে উঠাইবার প্রচেষ্টা করা।"

কর্মপদ্ধতির কোনও একটিকেও স্বাধীনতার অঙ্গীভূত করিতে না পারার মূলে রহিয়াছে "কর্ম একান্ত জড়, মৃত, নিরেট"—এই মনোবৃত্তি। অদ্বৈতবাদ কর্মের যে কঠিন পরিচ্ছিন্ন রূপ দেখিয়াছে

উহা ছাড়া কর্মের আরও যে কোন রূপ আছে, ইহা ইহারা এ যাবৎ বুঝিয়াই উঠিতে পারে নাই। বেচারী গরীব কাটুনীর হাতে চরখা দেয় এক আধ পয়সা, আর জওহরলালের হাতের চরখা আনিতে পারে স্বরাজ। চরখার এই আপেক্ষিক রূপ দেখিবার দিন আজ আইনস্টিনের আপেক্ষিকবাদের (Relativity) প্রচারের ফলে আসিয়াছে। অহংবুদ্ধির স্তরে দাঁড়াইয়া চরখা দেয় "প্রত্যাশিত ও সীমাবদ্ধ মূল্য", কিন্তু কর্মার্পণের স্তরে দাঁড়াইলে সেই চরখাই দিতে পারে অপ্রত্যাশিত ও অসীম মূল্যবান্ ঐ স্বরাজ। চরখার এই পদোন্নতির খবরই গীতায় আছে। কর্ম যখন বিশ্বরূপতার পদ প্রাপ্ত হয় তখনই চরখা ও স্বরাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

মহাত্মাজী বিশ্বের সর্বশেষ দর্শনকে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবর্তন করিয়া এক যুগান্তরকারী বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হইলে বুঝিয়া উঠা খুব দুষ্কর হইবে না যে, ইহার চেয়ে বড় বিপ্লবের কল্পনা কেহই করিতে পারেন নাই। ভাবুকের বিপ্লব ইহার অনেক নিম্নস্তরের। এই বিপ্লব জনসাধারণের বিপ্লব, অব্যাহত গতিতে অনন্তদূরপ্রসারী। বিপ্লব এতদিন প্রচারিত হইয়াছে বুদ্ধিমান্ ভাবুকদের দ্বারা; এইবার বিপ্লব প্রচারিত হইবে রসিক কর্মীদের দ্বারা। এইবার এই জড়লোকই হইবে গোলোক বৈকুণ্ঠ। এতদিন এই জড়লোক ছিল গোলোকের কাছে অস্পৃশ্য। এই অস্পৃশ্য জড়লোককে বিপ্লবময় গোলোকের পদে সমাসীন করিবার জন্যই আজ কর্মবিপ্লবের সূচনা। ধরার ধূলিতেই হইবে আজ অজড় গোলোক-বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি মোক্ষলোকের বিশ্রামস্থান। জড় ও বিপ্লব সমন্বিত হইয়াই গড়িয়া তুলিবে ধরার বুকেই শ্রীক্ষেত্র, পুরুষোত্তমক্ষেত্র।

লক্ষ লক্ষ কর্মী নিশ্চয়ই মহাত্মাজীর এই পুস্তিকা পড়িয়াছেন। এই পুস্তিকার অন্তর্নিহিত কর্মগত এই পরম বিপ্লবের খোঁজ কয়জনের মিলিয়াছে জানি না। অথচ বিপ্লবের মূর্তি হিসাবেই তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কর্মপদ্ধতিকে প্রচার করিয়াছেন।

এই পুস্তিকাখানিকে রাজনীতির দর্শনশাস্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। এই বই পড়িবার কালে সাধারণতঃ দার্শনিক সূত্রগুলি চোখের সামনে ধরা পড়ে না। সেগুলিকে ধরাইয়া দেওয়াই বর্তমান লেখকের রচনার প্রয়োজন। এই দর্শন ধরিতে না পারিলে এই কর্মপদ্ধতিও ধীরে ধীরে বাতিল হইবে। সে সন্দেহ মহাত্মাজীর নিজেরও আছে, যখন তিনি সন্দেহের সুরেই পুস্তিকা শেষ করিয়াছেন।

খাদিকর্ম মহাত্মাজীর কাছে বিশ্বকর্ম। সর্বকর্মই বিশ্বরূপায়িত হইলে তাহা হয় বিশ্বকর্ম, বিপ্লব। তথাপি মহাত্মাজী সকল কর্মের মধ্যে খাদিকর্মকেই কেন বাছিয়া লইয়াছেন, এইবার আমরা তাহারই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। খাদি সম্বন্ধে এই জ্ঞান না থাকার জন্য খাদি দেশে প্রেরণা আনিতে পারে নাই।

"একবার কল্পনা করুন, জাতির সমস্ত লোক কার্পাস হইতে আরম্ভ করিয়া সূতা-কাটার কার্য করিতেছে। তবে সমস্ত জাতির উপর উহার ঐক্যবিধায়ক ও শিক্ষাপ্রদ প্রভাব কত বড় হইবে বিবেচনা করুন, বিবেচনা করুন ধনী-দরিদ্রের ভিতর একই শ্রমের যোগযুক্ত হওয়ায় সমতার ভাব কত কার্যকরী হইবে।" সকল কর্মপদ্ধতির মধ্যেই বিপ্লবী মনোবৃত্তি রহিয়াছে; সেবাবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত খাদির অন্তরে সেই বিপ্লবী মনোবৃত্তিকেই "খাদি-মনোবৃত্তি" বলিয়া মহাত্মাজী অভিহিত করিয়াছেন। খাদির ভিতর রহিয়াছে 'ঘরে-ফিরিয়া-আসা'র মনোবৃত্তি, কেন্দ্র হইতে পরিধিতে আসার প্রচেষ্টা। জনসাধারণের স্তরই প্রত্যেকের স্ব-ঘর। চরখাই মানুষকে প্রথম ঘরে ফিরিয়া আসার কথা শুনাইয়াছে—ইহাই তাহার প্রথম বিশ্বরূপতা। বিশ্বমানবের আঙ্গিনায়ই খাদির কেন্দ্র খুলিতে হইবে। জনগণের মধ্যে 'ঐক্য' আনিবার কেন্দ্র হইবে চরখা; ঐক্যবিধায়ক হিসাবে চরখার গৌরব থাকাটাই ইহার দ্বিতীয় বিশ্বরূপতা। কিন্তু মানুষ কেন চরখার ভিতর

ঐক্যবদ্ধ হইবে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়। মানুষ 'সমপ্রয়োজনের' ক্ষেত্রে একত্র হয়, যদি সেই সমপ্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়া সে 'সমফল' আস্বাদন করিতে পারে। বৃটিশ সঙ্ঘবদ্ধ ; তাহার মূলে রহিয়াছে, সে যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয় তবে তাহার সাম্রাজ্যই সে রক্ষা করিতে পারিবে না এই চেতনা ; সমপ্রয়োজনের তাগিদেই তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ।

অন্ন-বস্ত্র সকলেরই সমানভাবে প্রয়োজন। অন্ন ও বস্ত্রের আন্দোলনে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, সাধু-অসাধু, নর-নারী বুর্জোয়া-প্রলিটেরিয়ট জাতিশুদ্ধ লোকের সহানুভূতি থাকিবেই। অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন সকলেরই সম। অন্ন-বস্ত্র ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনই সকলের সম নয়। বেতারবার্তা প্রভৃতিতে কাঙ্গালের কি প্রয়োজন ? যাহাদের জীবন যাপনের প্রশ্নই আজ বড় প্রয়োজন তাহাদের কাছে উহাদের মূল্য কতটুকু ? অন্ন-বস্ত্র বিশ্ববাসীর মৌলিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূরণ হইলেই তবে অন্যান্য প্রয়োজনের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। সেইজন্যই জাতি গঠনের সাধনায় ভারতের অন্ন-বস্ত্রের ক্ষেত্রে ঐক্যগঠনের প্রশ্ন উঠিয়াছে।

কিন্তু অন্ন-বস্ত্রে সকলেই সমপ্রয়োজন হইলেও মহাত্মাজী কেন বস্ত্রসৃষ্টিকে অন্নসৃষ্টি অপেক্ষা বেশী মূল্য দান করিলেন ? শ্রমগত সমতা একমাত্র বস্ত্রসৃষ্টিতে আছে বলিয়াই উহার শ্রেষ্ঠত্ব। অন্নসৃষ্টিতে যে শ্রমের প্রয়োজন হয় সেই শ্রম করিবার সামর্থ্য কয় জনের আছে ? অন্নসৃষ্টির আন্দোলনে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আহ্বান করিলে সেখান হইতে কোনও সাড়া মিলিবে না। অহিংসভাবে জাতিগঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন বৃহৎসঙ্ঘ রচনা করিবার। বৃহৎসঙ্ঘ সৃষ্টি করিতে হইলে যে কর্মে সর্বাপেক্ষা বেশী মানুষ শ্রম দ্বারা যোগ দিতে পারে তেমন কর্মই বাছিয়া লইতে হয়। চরখা কাটিবার মত শ্রম করিবার শক্তি খুব দুর্বল মানুষেরও আছে, শ্রমসমতার বিচারে চরখার স্থান তাই উচ্চে। বস্ত্রের প্রয়োজনেও সকলে "এক", সৃষ্টির

ব্যাপারেও সকলে "এক" হইতে পারে—এই দ্বিবিধ উপায়ে চরখা "ঐক্যবিধায়ক" বলিয়াই ইহা বিশ্বরূপ। ইসলামের উপাসক যে এত সুসংবদ্ধ, তাহার মূলেও রহিয়াছে তাহাদের এই কর্মগত ঐক্যবিধান। নমাজে আমীর-চাপরাশী 'এক' পংক্তিতে দাঁড়াইবার সুযোগ পাইয়াছে, প্রকাণ্ড নিমন্ত্রণেও তাহারা ঐক্যবদ্ধ। কর্মক্ষেত্রে যাহারা এক ও সঙ্ঘবদ্ধ নয়, ভাবক্ষেত্রের ঐক্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কখনও তাহাদিগকে 'এক' করিতে পারে না। ভারতবর্ষ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-এর উপাসক, অথচ সে-ই অনেক ধর্ম, অনেক জাতি, অনেক সম্প্রদায়ের কাড়াকাড়ির মধ্যে পড়িয়া সবচেয়ে বেশী হাবুডুবু খাইতেছে। ভাবাদ্বৈতে কুলাইবে না, যদি না তাহার সঙ্গে ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত আসিয়া যোগ দেয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্রিয়াক্ষেত্রে 'এক' হওয়াই ক্রিয়াদ্বৈত, দ্রব্যসম্বন্ধে 'এক' হওয়াই দ্রব্যাদ্বৈত।

ভারতবর্ষ দীর্ঘ বৎসর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াদ্বৈত স্থাপন না করার ফলে আজ সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের পিছনে। মুসলমানদের নমাজগত ঐক্যকে বৈষ্ণব মহাজনগণ হিন্দুসমাজে কীর্তনের রূপে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন, ভোজনগত ঐক্যকে মহোৎসবের সহায়ে সামাজিক ঐক্যে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিপুল প্রয়াস করিয়াছেন। সনাতন সমাজ কিন্তু সে 'ঐক্য' মানিয়া লয় নাই ; সনাতন সমাজে যে অনৈক্য পূর্বে ছিল আজও তাহাই চলিতেছে। সর্বক্ষেত্রে এই ঐক্য আনিবার জন্যই কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি। আজ রাষ্ট্রক্ষেত্রে ঐক্য আনিবার উদ্দেশ্যেই চরখার প্রচলন। তৃতীয়তঃ, চরখা শিক্ষাপ্রদ বিশ্বরূপ ; চরখার শিক্ষা বিশ্বরূপের শিক্ষা, বিকেন্দ্রীকরণের (decentralisation) শিক্ষা। কেন্দ্রগত প্রয়োজন চরখার নাই। কেন্দ্রে প্রয়োজন রহিয়াছে সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন বড় লোকদের, চরখা কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের যন্ত্র। "যাহাদের একটু জমি আছে, এমন প্রত্যেক পরিবারই অন্ততঃ নিজ পরিবারের উপযোগী তূলা জন্মাইতে পারেন। তূলার চাষ করা সহজ।" "খাদি প্রক্রিয়ার

শুরু হইতেই বিকেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হয়। আজিকার দিনে তূলার চাষ কেন্দ্রীভূত এবং রেলে করিয়া তূলা ভারতের বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া যায়।…যুদ্ধের পূর্বে এবং আজও তূলা কৃষককে নগদ টাকা দেওয়ার মত ফসলই আছে। আর সেইজন্যই ইহা বাজারের উঠতি-পড়তির উপর নির্ভরশীল। খাদিপরিকল্পনা অনুসারে কার্পাস-উৎপাদন এই অনিশ্চয়তা ও জুয়ার ভাব হইতে মুক্ত। চাষী তাহার প্রয়োজন অনুরূপ উৎপাদন করিবে। চাষীর তো এই কথাই বুঝা দরকার যে, তাহার প্রধান কর্তব্য হইতেছে নিজ প্রয়োজন অনুরূপ উৎপন্ন করা। যদি তাহাই করে তবে বাজার মন্দা বলিয়া তাহার সর্বনাশ হইবার সম্ভাবনাই কমিয়া যায়।”

বস্ত্র-উৎপাদনের কৌশল সম্বন্ধেও রহিয়াছে ঐ বিকেন্দ্রীকরণ। রেল স্টীমার সৃষ্টি করিবার কৌশল জানে সমাজের অতি অল্পসংখ্যক কারিগরই ; চরখার উৎপাদনের কৌশল জানিতে বড় বড় কারখানায় যাইতে হয় না। এখানেও তাহার বিকেন্দ্রীকরণ রহিয়াছে। উৎপাদনের শ্রমেও বিকেন্দ্রীকরণ রহিয়াছে বলিয়াই কোনও বিশেষ দলের হাতে বস্ত্রসৃষ্টি নির্ভর না করিলেও আটকায় না।

সবচেয়ে বড় বিকেন্দ্রীকরণ রহিয়াছে তাহার 'ফল' বিশ্বমানবের সেবায় ছড়াইয়া দেওয়ার মধ্যে। “খাদি-মনোবৃত্তিতেই জীবনযাপনের আবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণ ক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ রহিয়াছে। সেইজন্য এই নির্ধারণ চলিয়া আসিয়াছে যে, প্রত্যেক গ্রামকেই নিজের আবশ্যক বস্ত্র উৎপাদন করিতে হইবে এবং তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা কতকটা করিয়া বেশী উৎপন্ন করিতে হইবে।” চরখার অন্তরে নিহিত কর্মত্যাগকে বিশ্বরূপার্পণ বলিয়াই পূর্বে নির্ধারণ করিয়াছি। জনসাধারণের কর্মই আমার ভিতর দিয়া স্ফুরিত হইতেছে, আমি জনসাধারণের কর্মই বিশ্বরূপপ্রীত্যর্থে করিতেছি—ইহাই কর্মত্যাগ। কিন্তু কর্মত্যাগ করিলেই কর্মফলত্যাগ হয় না। কর্মত্যাগ করিলেও ফল আসিবে। বিপ্লবীকে তখন সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে

ফলাস্বাদন করিবার অভিসন্ধি তাহার হৃদয়ে না জাগে। কর্মত্যাগী কর্মফলত্যাগী নাও হইতে পারেন, যেমন বর্তমানে পদ লইয়া কাড়া-কাড়ির ভিতর স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছে। বিপ্লবের ভিতর দিয়া যে স্বরাজ-ফল লাভ হইল, সে ফল জনসাধারণকে বিলাইয়া দিয়া নিজে তাহাদের সেবকহিসাবে সেবাসৌভাগ্য কয়জন নিতে পারিল? কর্ম-সন্ন্যাসী হয় অনেকে, ফলসন্ন্যাসী হয় কয়জন? একমাত্র চরখাকে আশ্রয় করিয়াই উৎপাদন-বিতরণ ক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণের শিক্ষা (training) নেওয়া ও দেওয়া সহজ ও সম্ভবপর। একবার বিকেন্দ্রী-করণের শিক্ষালাভ হইলে তখন সর্বক্ষেত্রে সর্বসৃষ্টিব্যাপারে উহার সাধনা আপনা আপনি ছড়াইয়া পড়িবেই। যাহার উৎপাদন সকলকে লইয়া, উৎপাদনের শ্রম সকলের সমভাবে, যেখানে ফলের অংশও সকলেরই থাকে, কেহ তাহা একাকী ভোগ করিতেও চায় না, করিতেও পারে না, তাহাই তো গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ সাধন। সৃষ্টি করার ব্যাপারে সকলের ঐক্যবদ্ধতা না থাকিলে 'ফলে'র বেলায় সমবণ্টন হইতেই পারে না—এই মহাসত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চরখার ভিতর বিকেন্দ্রীকরণের শিক্ষা হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"আমার দলই সমগ্র দেশের স্বাধীনতা আনিতে সক্ষম; কিন্তু স্বরাজ আমার নয়, ইহা সর্বসাধারণেরই"—এই উক্তি বুদ্ধির ভণ্ডামি। স্বাধীনতা কেহ কাহাকে দিতে পারে না, উহা নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন দ্বারাই অর্জন করিতে হয়; কেহ কাহারও স্বরাজ আনিয়া দিবে না, দিতে পারে না। সৃষ্টি করাই স্বরাজের মূল রহস্য। চাই সৃষ্টিসম্বন্ধীয় সর্বক্ষেত্রে সমতার আস্বাদন ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সর্বক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের বিপ্লবই খাদি-মনোবৃত্তি। "ইহা করিতে হইলে সকলেরই মনোবৃত্তিতে ও রুচিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা আবশ্যক। কতগুলি ব্যাপারে আহিংসার পথ যেমন সহজ, আবার কতগুলিতে ইহা তেমন কঠিন। ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনকে পূতভাবে স্পর্শ করে এবং এমন একটা শক্তিতে তাহাকে মণ্ডিত করে

যাহা তাহার ভিতর সুপ্ত ছিল এবং যাহা তাহাকে ভারতীয় জনসমুদ্রের প্রত্যেক বিন্দুর সহিত নিজের একত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে। এই ধরনের অহিংসা মোটেই একটা শূন্য ফাঁকা জিনিস নয়, যুগ যুগ ধরিয়া আমরা ইহাকে ফাঁকা বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছি। পরন্তু মানুষ যত একত্বের আস্বাদ পাইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা তেজঃপূর্ণ শক্তি, যে শক্তির উপর মনুষ্যস্বভাব ও অস্তিত্বই নির্ভর করে। আমি ত এই শক্তিই কংগ্রেসের হাতে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং কংগ্রেসের মারফতে সারা জগতকে দিতে চাহিতেছি। আমার কাছে খাদি ভারতীয় মনুষ্য-সমাজের প্রতীক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমতার প্রতীক; এবং এই হেতু জওহরলালের কাব্যময় ভাষায় ইহা 'ভারতীয় স্বাধীনতার রাজপোশাক'।"

উৎপাদন বিষয়ে প্রয়োজনসমতা, উৎপাদনের শ্রমসমতা, এবং উৎপাদনের ফলবণ্টনসমতার মধ্যে যে অহিংসা রহিয়াছে ইহা বুঝিয়া উঠা "খুবই কঠিন"। এই সমতাই জীবনের গূঢ়তম প্রদেশের সম্পদ; ইহার ভিতর দিয়া সারা বিশ্বের সঙ্গে একত্বের আস্বাদন সম্ভবপর হয়। ইহা ফাঁকা নির্বিশেষ বস্তু নয়, ইহাই সর্বাপেক্ষা তেজঃপূর্ণ শক্তি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূলে রহিয়াছে এই অহিংসানীতি।

একটি গ্রামকে অর্থনৈতিক হিসাবে শিল্পবিস্তারের দ্বারা স্বয়ংপূর্ণ (self-contained) করাই হইতেছে খাদি-প্রক্রিয়ার মূলগত প্রয়োজন। খাদি ব্যতীত "অপর গ্রামশিল্প" গুলির স্থানও কম নয়। "অপর সকল শিল্পের ভিত্তি খাদি হইতে ভিন্ন প্রকারের। ঐ সকল কাজে স্বেচ্ছামূলক ভাবে খাটিবার ক্ষেত্র কম। প্রত্যেক শিল্পেই গুটিকতক লোকের শ্রমের আবশ্যক। ঐ সকল শিল্প খাদির সহায়কের স্থান লইয়া আছে। খাদি ছাড়া এগুলি বাঁচিতে পারে না। আর এগুলি না থাকিলে খাদির মর্যাদাও আবার অনেকখানি মলিন হইবে। গ্রাম-অর্থনীতির পূর্ণতা ততক্ষণ হইবে না, যতক্ষণ না মৌলিক গ্রামশিল্প-

গুলিতে যথা—হাতে তৈরী আটা, ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল, সাবান তৈরী, দেশলাই তৈরী, চামড়ার কাজ, ঘানিতে তেল তৈরী ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হইতেছে।…যখন আমরা গ্রামমনোবৃত্তিসম্পন্ন হইব, তখন আমাদের পশ্চিমের নকল বস্তুর আবশ্যক হইবে না, অথবা যন্ত্রনির্মিত দ্রব্যের আবশ্যক হইবে না, পরন্তু তখন আমরা এমন একটা খাঁটি স্বদেশী রুচির পোষক হইব যাহা নবভারতের কল্পনার পরিপোষক হইবে—যে নবভারতে না থাকিবে বৃত্তিহীনতা এবং অনাহার, এবং যেখানে আলস্য বলিয়া কোনও পদার্থই নাই।" গ্রামমনোবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার অর্থ হইতেছে "বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি, অন্তর মম গোপনে যাক ভরে তোমার দানে তোমার দানে তোমার দানে।"—রবীন্দ্রনাথ। আগাগোড়া কর্মপদ্ধতির দ্বারা "বাহিরের ভিক্ষা-ভরা থালি"র লোভ ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বরূপের গোপন দানে অন্তরকে ভরিবার লালসা যদি জাগ্রত না হয়, তেমন কর্মপদ্ধতি বিপ্লবীর নয় এবং তাহা নবভারতের পরিকল্পনার অনেক দূরে, উহা বিষয়ীদেরই কর্মবন্ধন মাত্র। উহা দ্বারা পয়সা লাভ হইতে পারে, স্বরাজ-আস্বাদন কিছুতেই হইবে না। দেশ তখনও পরাধীন ছিল, যখন গ্রামে গ্রামে ঢেঁকিতে ধান ভানা চলিত, ঘানিতেও তৈল তৈরী হইত। কিন্তু উহাদের অন্তর্নিহিত স্বরাজের অর্থবোধ ছিল না বলিয়াই উহারা স্বাধীনতার যন্ত্ররূপে বা আস্বাদনরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। আজ সেইগুলিরই অন্তর্নিহিত বিপ্লব-ঘন অর্থ বাহির করিয়া বিপ্লবেরই রূপ হিসাবে কর্মক্ষেত্রে চালু করিতে হইবে। তখনই শুধু সব আবার নূতন রূপে উদ্ভাসিত হইবে; চরখা, ঢেঁকি, ঘানি সব হইবে স্বরাজের মূর্তি।

সর্বধর্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য

মানুষ বিশ্বধর্মী, বিশ্বকর্মী। দেশ কাল পাত্রের আবেষ্টনে, দৃষ্টিভঙ্গি-ভেদে বিশেষ বিশেষ ধর্ম বা কর্মের সঙ্ঘবদ্ধ আস্বাদনের জন্যই সৃষ্টি হয় বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের। মানুষ এই হিসাবে একাধারে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই-ই ; কোনও একটিকে বাদ দিয়া অপরটি হইবার যো নাই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় বা কর্মসম্প্রদায় যখন অখণ্ড মানুষকে ছাপাইয়া ওঠে, মানুষের অন্তরের বিশ্বরূপ-জীবনকে দাবাইয়া রাখিয়া সেই "সহজ" মানুষটিকে একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক করিয়া তোলে, তখনই সত্য মানুষটি শিহরিয়া ওঠে, চিৎকার করিয়া ওঠে, যাহার স্বাভাবিক পরিণতিতে বিশ্বে তখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রক্তপাত শুরু হয়, নিজের অন্তরাত্মার কান্নার সহজ সরল অর্থ ধরিতে না পারিয়া ছিন্নমস্তার মত নিজের মস্তক নিজে ছিন্ন করিয়া নিজেরই রক্ত নিজে পান করে। হিন্দু-মুসলমান যখন একের বুকে অন্যে ছুরি মারে, তখন নিজের বুকেই তাহা মারা হইতেছে, বিশ্বরূপ মানুষই আৎকাইয়া উঠিতেছে। আজ আর মানুষের জন্য ধর্ম নয়, ধর্মের জন্যই মানুষকে বলি দেওয়া হইতেছে। যে ধর্মের নামে এমন অবাধ নরবলি চলিতে পারে, সে ধর্ম কি মানুষের যোগ্য ? উহা কি পৌত্তলিকতা নয় ? সত্যধর্ম লইয়া খুনাখুনি হয় না ; ধর্ম মানুষকে রক্ষাই করে।

ধর্মের খোসা লইয়াই অভিসন্ধির লড়াই চলিতে পারে। দোল, রথ, ঈদ লইয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অহরহই হইতেছে ; এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা কি ধর্মের দৈন্য, ব্যর্থতা ও অন্তঃসারশূন্যতারই প্রমাণ দিতেছে না ? সত্যিকার ধর্ম যদি হইত, তবে ধর্ম ও মানুষের মধ্যে এই সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি হইত না, ধর্ম মানুষের রক্ত পান করিত না, রক্ত সঞ্চারই করিত। তখন মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইত।

মানুষের মুখ চাহিয়া ধর্ম নিজের রূপ ও গতি ঠিক করিত, প্রয়োজন হইলে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিত; আবার ধর্মের মুখের দিকে তাকাইয়া মানুষও নিজকে সংযত বা প্রসারিত করিত, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মরণ বরণ করিত। ধর্ম ও মানুষ আজ পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী। কি অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও নির্লজ্জ একটা অবস্থার ভিতর দিয়া জাতি চলিয়াছে! কোথায় হইবে ইহার প্রতিকার? ধর্ম যখন মানুষের চেয়ে বড় সত্য, তখনই ধর্মরক্ষার নামে মানুষ অন্যধর্মীর রক্তপান করিতে ছোটে, তখনই সে ভুলিয়া যায় যে, মানুষের জন্য ধর্মেরও আত্মবিসর্জনের প্রয়োজন হইতে পারে। মানুষের জন্য ধর্মের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইলে ধর্ম একদিন মানুষের মুখ চাহিয়া মুছিয়াও যাইতে পারিত। ভগবান্ বুদ্ধ এমনই একটি ধর্মের ভিত্তিপত্তনের সূচনা দিয়া গিয়াছেন।

মানুষের জন্য ধর্ম এবং ধর্মের জন্য মানুষ—দুই-ই সত্য হইতে পারিত, যদি ধর্ম বলিতে বিশেষ কোন ধর্ম না বুঝাইয়া সর্বধর্মসমন্বয়ই বুঝাইত। সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের স্বধর্ম। প্রতি মানুষ এই হিসাবে স্বধর্মী, সর্বধর্মী। গান্ধীজী বলিতেছেন, "এই প্রকার ঐক্য লাভের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক কার্য হইতেছে প্রত্যেক কংগ্রেসীর এই ভাব অনুভব করা যে, তিনি তাঁহার নিজের ভিতরেই হিন্দু-মুসলমান-জরথুশত্রীয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি ভাবিবেন যে, তিনি নিজের মধ্যে হিন্দুও বটেন এবং হিন্দুধর্মের বহিঃস্থ যত ধর্ম আছে সেই সব ধর্মীও বটেন।" বাঙ্গলার রামকৃষ্ণ, নিত্যগোপাল বর্তমান যুগে সর্বপ্রথমে এই সর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ বিশ্বের মাঝে নিজেদের জীবনের আস্বাদন দ্বারা বপন করিয়া গিয়াছেন। আজ সেই বীজই বৃক্ষাকারে ফুলে ফলে আত্মপ্রকাশ করিয়া স্নিগ্ধ ছায়াদানে সন্তাপ দূর করিবার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোনও একটি বিশেষ ধর্ম কি মানুষের অন্তরাত্মার ক্ষুধা সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারে না? সর্বধর্মী হইবার

কি প্রয়োজন তাহার আছে? শুধু কি রাজনৈতিক প্রয়োজন হাঁসিলের জন্যই, অন্য সম্প্রদায়কে তোষণের জন্যই, সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা, না, ধর্মাস্বাদনের দিকে চাহিয়াই সর্বধর্মসমন্বয়ের তেমন বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে? ইহা সত্য যে, প্রতি ধর্মই বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে, বিশেষ পাত্রের জন্য বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, প্রত্যেকটি ধর্মই স্বয়ংপূর্ণ, উহা ঐ সম্প্রদায়ের সকল স্তরেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তুল্যভাবেই সত্য যে, কোনও বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র বা বিশেষ দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমগ্র মানবসমাজকে, এমনকি কোনও বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানুষকেও আটকাইয়া রাখা যাইবে না। সব বিশেষত্বকে ছাপাইয়া অখণ্ড বিশ্বরূপ ব্যষ্টি মানব ও মানবসমাজ আগাইয়াই চলিয়াছে, চলিবেও। বাল্য যেমন বাল্য হিসাবে স্বয়ংপূর্ণ হইলেও ষোল-আনা জীবনকে নিজের মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই, জীবন যেমন বাল্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া যৌবনে ছুটিয়া আসিয়াছে, যৌবন যৌবন হিসাবে স্বয়ংপূর্ণ থাকিলেও জীবন যেমন যৌবনকে ডিঙ্গাইয়া প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডীতে আসিয়া পড়িয়াছে, তেমনি কোন ধর্ম স্বয়ংপূর্ণ হইলেও সহজ মানুষের সর্বধর্মসমন্বয়ের, জীবন্ত ধর্ম লাভের ক্ষুধা মিটাইতে পারিবে না। জীবন্ত মানুষের ধর্ম ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতেই পারে না। কোনও বিশেষ ধর্মে আটকাইয়া যাইবার অর্থ সেখানে তাহার আধ্যাত্মিক মৃত্যুলাভ বা কবর-প্রাপ্তি। কোনও বিশেষ নদীর মধ্যে যেমন বিশাল ও গভীর সাগরকে প্রবেশ করানো সম্ভবপর নয়, বিশেষ কোনও জেলার মধ্যে যেমন সমগ্র বাঙ্গলাকে ঢুকাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা, তেমনি বিশেষ কোনও ধর্মের মধ্যে সমগ্র মানবকে টানিয়া আনিবার চেষ্টাও বদ্ধপাগলের চেষ্টা। সমগ্র মানবসমাজ হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীষ্টান কিছুই হইবে না—এই সহজ সরল সত্য কথাটা ভুলিয়া গিয়া হিন্দু যদি বিশ্বের সব জাতিকে তথাকথিত হিন্দু বানাইতে চায়, ইসলাম যদি তাহার বুদ্ধির ভিতর

সারা বিশ্বকে গ্রাস করিতে চায়, খ্রীষ্টান যদি স্বপ্ন দেখিয়া থাকে যে সমগ্র বিশ্ব অদূর ভবিষ্যতে খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে, আমরা বলিব তেমন ভবিষ্যৎ অনন্তকালেও আসিবে না। ভারতের বুকে অদ্বৈতবাদের বজ্রনির্ঘোষে সাংখ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন কেহই ক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায় নাই। বহু রক্তপাতের ভিতর দিয়াও সবই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; পৃথিবীর বুকে অনন্তকাল ধর্মবৈচিত্র্য বজায় রহিয়াছে, থাকিবেও। একটা বৈচিত্র্য অপর বৈচিত্র্যকে সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্য থাকিবেই। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির শোভা ও প্রাণ।

বর্তমান যুগের সভ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, কোন বৈচিত্র্যকেই মুছিয়া ফেলা চলিবে না। 'সবই যখন থাকিবে অথচ থাকিতেও হইবে একই দেশে, তখন কাটাকাটি করিয়া থাকা তো আর মানুষের মত থাকা নয়, অতএব মতসহিষ্ণুতার (tolerance) অনুশীলন কর, অপর ধর্মকে তাহার মত থাকিতে দেও, তুমি তোমার মত থাক'—আজকাল এইরূপ একটা মতবাদ চলিতেছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, মতসহিষ্ণুতা বলিয়া কোন জিনিস বাস্তবের দেশে নাই। হয় অন্য সবগুলিকে আমার কুক্ষিগত করিব, নয় তো সবগুলির সমন্বয়ই আমার ধর্ম হইবে—ইহার যে কোন একটি ছাড়া অন্য কোনও পথ নাই।

বৈষ্ণব বলিতেছেন—আগে শাক্ত হইয়া পরে বৈষ্ণবতার উচ্চ স্তরে উঠিতে হয়। দেখিতেছ না, বৃন্দাবনে শিবদুর্গা রাধাগোবিন্দের দ্বারী ? শাক্ত বলিতেছেন—ওগো, তোমার রাধাকৃষ্ণ কাশীধামে কেমন করিয়া তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সে কাহিনী কি তন্ত্রশাস্ত্রে পড় নাই ? বৈষ্ণব হওয়ার পরেও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হয়। প্রত্যেকেই মনে করিতেছে—আমি সর্বপ্রথম, সব আমার পশ্চাতে, আমার স্তরে না আসা পর্যন্ত কাহারও উদ্ধার নাই। এই ভ্রান্তির মূলে রহিয়াছে বহুত্ববিহীন একত্বের উপর কঠিন অদ্বৈতবাদ গড়িবার প্রচেষ্টা।

বহুকে সকলেই মানে, কেন না না-মানিয়া উপায় নাই। তাহাদের

প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব তো চোখের সামনেই দেখিতেছে; কাজেই সেখানে তাহাদের বুদ্ধি একটি সিঁড়ি স্থাপন করিয়া তাহাদের মুনাসিব ধর্মমতকে সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে স্থাপন করিয়া অপরগুলিকে তাহার নীচে ক্রমান্বয়ে সাজাইয়া রাখিয়াছে। এইভাবে একটি সিঁড়ির (ladder system) স্থাপনা করিয়া মানুষের ধর্মবুদ্ধি একত্বের আস্বাদন, অদ্বৈতের আস্বাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এইভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায় তার মতানুযায়ী একটি সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়াছে। এইভাবে প্রতি সম্প্রদায়ের অদ্বৈতগুলি আবার ঠোকাঠুকি করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, কোনও বৈচিত্র্যই মুখ্য নয়, কেহ গৌণও নয়; সবই স্বয়ংপূর্ণ এবং মুখ্য। ক্ষেত্রবিশেষে কেহ হয় মুখ্য, অন্য ক্ষেত্রে সেই-ই আবার হয় গৌণ। এইভাবে সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিবার যোগ্যতা থাকিলেই ধর্ম হয় জীবন্ত ও তাজা, এক। প্রত্যেক ধর্মের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে বর্তমান যুগের তথাকথিত উদার মতসহিষ্ণুদের আপত্তি না থাকিলেও এই বিষয়ে অন্তরে অন্তরে প্রত্যেকেরই বিশেষ মৌলিক আপত্তি রহিয়াছে যে, সে কেন অপরের বৈচিত্র্য আস্বাদনের জন্য ছুটিবে? তাহার ধর্ম স্বয়ংপূর্ণ, তাহার মধ্যেই তাহার সবকিছু প্রয়োজন মিটিতে পারে, অন্য ধর্মের যাজন করিবার সার্থকতা কোথায়? —যুক্তি ও প্রয়োজন আছে বলিয়াই আজ সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রশ্ন উঠিয়াছে।

সত্য বটে, প্রতিটি অংশ স্বয়ংপূর্ণ (self-contained), কিন্তু কোনও একটি স্বয়ংপূর্ণ অংশ কি নিজের দ্বারাই নিজে সমগ্রের ক্ষেত্রে সার্থক হইতে পারে? সমগ্র বাঙ্গলার এক একটি বিচিত্র আস্বাদন প্রত্যেকটি জেলার বুকে আছে বলিয়াই প্রত্যেক জেলাবাসী বলিতেছে "আমি বাঙ্গালী।" কিন্তু মেদিনীপুর জেলার মধ্যে বাঙ্গলার যে রূপ-গুণ-কর্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তো রাজসাহীতে ফুটিয়া উঠে নাই, অথচ দুই-ই বাঙ্গলার অংশ। মেদিনীপুরের অন্তরের বাঙ্গলার রূপ-গুণ-কর্ম যেমন সত্য, রাজসাহীর অন্তরের রূপ-গুণ-কর্মও তুল্যরূপেই

সত্য। এখন মেদিনীপুর বা রাজসাহীকে যদি সমগ্র বাঙ্গলা হইতে হয়, সমগ্র বাঙ্গলারই রূপ-গুণ-কর্ম আস্বাদন করিতে হয়, তবে কি দুইয়েরই হৃদয়ে হৃদয়ে যোগযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন থাকিয়া যায় না? সমগ্র বাঙ্গলা মেদিনীপুর বা রাজসাহীর অন্তরকে স্বয়ংপূর্ণ করিয়াও তো তাহাদের বাহিরে রহিয়াছে। মেদিনীপুর বাঙ্গলার ততোটুকু আস্বাদনই করিতে পারিতেছে, বাঙ্গলার যতটুকু রূপ-গুণ-কর্ম তাহার অন্তরে রহিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য জেলার অন্তর্নিহিত বাঙ্গলার সহিত তাহার কোনও পরিচয় থাকিতেছে না। বিভিন্ন জেলার অন্তরের ভিন্ন ভিন্ন বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত না হইয়া, সব বাঙ্গালাকে অদ্বৈত বাঙ্গলায় পরিণত না করিয়া সে যদি তাহার নিজের অন্তরের বাঙ্গলা লইয়াই ষোল-আনা বাঙ্গালী থাকিয়া যাইতে চায়, তবে তাহা কি হইবার কোনও সম্ভাবনা আছে না কোনও কালে হইবে? সে যখন ষোল-আনা বাঙ্গালীই হইতে চাহিতেছে, নিশ্চয়ই মেদিনীপুরের বাঙ্গালী নয়, তখন হয় তাহার ষোল-আনা বাঙ্গালী হওয়ার বাসনাই ভুল ও অসঙ্গত, নয় তো তাহার অন্তরের বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব জেলার অন্তর্নিহিত বাঙ্গলাগুলিও প্রসুপ্ত ভাবে রহিয়াছে। মেদিনীপুর বা রাজসাহী একান্তভাবে নিজের ভিতরে থাকিয়া 'তত্ত্বতঃই' বাঙ্গালী বটে, কিন্তু বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহাকে বাঙ্গালী হইতে হইলে তাহাকে সর্ব বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন জেলার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতেই হইবে।

মেদিনীপুর যদি একান্ত মেদিনীপুর থাকিয়াই ষোল-আনা বাঙ্গলা হইতে চায়, তবে সে মেদিনীপুরও থাকিতে পারিবে না; তাহাকে মেদিনীপুর হইতে পিছনে হটিয়া মেদিনীপুরত্বের বিশেষত্বকে নির্বাপিত করিয়া নির্বিশেষ ফাঁকা বাঙ্গলায় পরিণত হইতে হইবে। মেদিনী-পুরকে তাহার রূপ-গুণ-কর্মকে আস্বাদন করিতে হইলে সমগ্র বাঙ্গলার অন্যান্য জেলার সহিত বুকে বুক মিলাইতেই হইবে, মেদিনীপুরকে ছুটিয়া যাইতেই হইবে সমগ্র জেলায় সমগ্র বাঙ্গলাকে আস্বাদন

করিবার জন্য, মেদিনীপুরের অন্তরের বাঙ্গলাকে অন্যান্য জেলার অন্তরের বাঙ্গলার সঙ্গে এক, অদ্বৈত বাঙ্গলায় সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য সব জেলাগুলি সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে কোনও বিশেষ জেলাই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, কেন্দ্রীয় অত্যাচারের তাল সামলাইতে পারিবে না।

কেন্দ্রের অত্যাচার সামলাইতে হইলে চাই পরিধিস্থ প্রত্যেক অংশগুলির সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। প্রত্যেকবারের আন্দোলনেও কি মেদিনী-পুর ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছে না, এদিকে তাহার দৃষ্টি খুলিতেছে না? মেদিনীপুরের আন্দোলন একাকী সফল হইবে না, যতদিন না সেই আন্দোলনকে প্রত্যেক জেলার বুকে ছড়াইয়া দিবার জন্য মেদিনীপুর প্রাণপাত না করে। একাকী মেদিনীপুর শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরের গৌরব রক্ষা করিতে পারিবে না, যদি না সে নিজেকে সমগ্র জেলায় ছড়াইয়া দেয়। সমগ্র জেলায় ছড়াইয়া না দেওয়ার ফলেই হিংসা আসিয়া পড়ে। ব্যাপকতা যদি তাহার দিনের পর দিন বাড়িত হিংসার আশ্রয় তাহাকে লইতে হইত না, অহিংসার এই অন্তর-কথা বুঝিবার দিন তাহার আসিয়াছে।

ধর্ম সম্বন্ধেও এই দৃষ্টান্তের অন্তর্নিহিত মহাসত্যটি উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রতিটি ধর্ম তাহার বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণে স্বয়ংপূর্ণ হইলেও যখন তাজা জীবন্ত, যখন সর্বধর্মসমন্বয়ই সত্যধর্মপদবাচ্য ও পূর্ণ, তখন প্রত্যে-কের বিশেষ বিশেষ ধর্মের সমগ্ররূপ আস্বাদনের জন্য এবং বিশেষতঃ আত্মরক্ষার জন্যও আত্মপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সর্বধর্ম-সমন্বয়ই স্বধর্ম, আত্মধর্ম, বিশ্বধর্ম, মানবাত্মার সর্বগুহ্যতম ধর্ম। সর্ব-ধর্মসমন্বয় না হইলে স্বধর্ম রক্ষাই অসম্ভব; উহা শুধু ভাবুকতা, উন্মত্ততা (fanaticism)। আজ প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ হইতে উদ্ভূত সর্ববিশেষসমন্বিত নির্বিশেষ ধর্মকে আস্বাদন করিতে হইবে, সর্ব-মানবকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। সর্বধর্মসমন্বয় হইলেই ধর্ম হয় মানুষের জন্য এবং ধর্মের জন্যও মানুষ। সর্বধর্মসমন্বয়ের স্তরে যদি

প্রয়োজন হয় ধর্মের জন্য মানুষ মরিলে সে মরা হয় সার্থক, আবার মানুষের জন্য তথাকথিত ধর্ম বিসর্জন দিলেও সে বিসর্জন দেওয়া হয় সার্থক। এই সর্বধর্মসমন্বয়ই মানুষের মহাশক্তি ; এইখানেই মানুষ ও সর্বধর্মসমন্বয় এক, অদ্বৈত, এইখানেই বিশ্ব সঙ্ঘবদ্ধ হইবার পরম সুযোগ লাভ করিতে পারে।

দেশ আগে, ধর্ম পরে কিংবা ধর্ম আগে, দেশ পরে—ইহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। মহাত্মাজী ছাড়া আর সব কংগ্রেস নেতা শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রের উপরই চাহিতেছেন ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে। মুসলিম লীগ চাহিয়াছিল ইসলাম ধর্মের উপর ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে, তাহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ হিন্দু-ভারত ও মুস্লিম-ভারত এই দুই ভাগে ভারতকে বিভক্ত করিতে। তাহাই তো শেষ পর্যন্ত হইল। প্রতি চিন্তার ভিতরেই রহিয়াছে একটা বিশেষ চিন্তাপ্রণালীর উপর দাঁড়াইয়া সারা ভারতকে সজ্ঘবদ্ধ করার বিশ্রী প্রচেষ্টা। কাজেই সজ্ঘর্ষ বাঁধিয়াছে প্রতি পদে পদে। দুইটি অদ্বৈতবাদের (monism) কুস্তি ভারতের বুকে চলিতেছে—রাজনৈতিক অদ্বৈতবাদ এবং আধ্যাত্মিক কঠিন অদ্বৈতবাদ ; কেহই ভারতবর্ষকে "অখণ্ড" গড়িতে পারিতেছে না। একান্ত রাজনৈতিক ভারতও পূর্ণ সত্য ভারত নয়, ইসলামের গণতন্ত্র ধর্মের ছাঁচে যে ভারতকে গড়িতে চাহিয়াছিল তাহাও সত্য ভারত নয়। সত্য ভারত হইবে সেদিন, যেদিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাবুকতা পরিপূর্ণ-ভারতের মধ্যে নিজেকে আস্বাদন করিবে, ইসলামের ধর্মের স্বপ্নও যেদিন সর্বধর্মসমন্বিত সত্যভারতের বাস্তব স্পর্শ পাইয়া কাটিয়া যাইবে। মহাত্মাজীর পরিকল্পনার ভিতর এই দুইয়েরই সম্মোহন কাটিয়া যাইবার সুযোগ ছিল। মহাত্মাজীর পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ জওহরলালের দেশও (India) বটে, মুসলিম লীগের ধর্মও (Religion) বটে।

মহাত্মাজী ছাড়া অন্য সব কংগ্রেস নেতাদের প্রথম বিপদ আসিয়াছে "দেশ প্রথমে, ধর্ম পরে"—এই মতবাদ প্রচারের ভিতর দিয়া।

'ভারতবর্ষ' 'ধর্ম'কে ডিঙ্গাইয়া 'প্রথম' থাকিবে কোন্ যুক্তিতে বা প্রয়োজনে ?—ইহার মীমাংসা দিবার দুঃসাহস কংগ্রেসের করা ঠিক হয় নাই। যেহেতু তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে, ধর্মের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও বাস্তব ধারণা নাই, যেহেতু তাঁহারা বিশ্বে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ইতিহাসেরই সহিত অধিকতর পরিচিত, সেই হেতুই ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপর তাঁহাদের জোর পড়া স্বাভাবিক। মহাত্মাজীর সুদূরপ্রসারিণী দৃষ্টি তাঁহাদের এই ভুল ভাঙ্গিবার জন্যই এই কর্মপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছে। কতখানি ভুল ভাঙ্গিয়াছে ভগবান্ জানেন। ভারতের কুম্ভমেলাও যে কংগ্রেস হইতে কম শক্তিশালী নয়, ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অন্তরাত্মায়ই যে উহার স্থান, উহার প্রভাব যে আজও ভারতের সংসারী সন্ন্যাসী সকলের উপরই বেশ শক্তভাবেই আছে, কংগ্রেসের মত বাহিরে কোন আন্দোলন সে না করিলেও যে অন্তঃসলিলা ফল্গুরই মত ধীরে ধীরে শান্ত সমাহিত ভাবে ভারতের অন্তরাত্মাকে সে পুষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি দেওয়া কংগ্রেসের উচিত ছিল। কংগ্রেস মনে করিয়াছে কুম্ভমেলাকে দিয়া কি তাহাদের প্রয়োজন ? কিন্তু কুম্ভমেলার মত এতবড় শক্তিশালী সঙ্ঘ যদি ভিতরে ভিতরে জাতিকে স্থিতিপ্রধান (static) অবস্থার উপদেশ দেন, কংগ্রেস কি সে জাতিকে গতিবেগযুক্ত (dynamic) করিতে পারিবে ? ব্রিটিশ চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সত্যিকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কুম্ভমেলার গোড়াকার চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তের সহিত পরিচয় লাভ আজ হউক কাল হউক করিতেই হইবে। এতবড় শক্তিশালী সঙ্ঘের কোন খোঁজ না করিয়া ভারতের কোনও স্থায়ী কল্যাণ হইতেই পারে না। মহাত্মাজী সত্য অহিংসা প্রভৃতির সাধনা কংগ্রেসে আনিয়া কংগ্রেস-কুম্ভমেলার মিলনের পথই সুগম করিয়াছেন। কংগ্রেসকে তো একদিনও শুনি নাই ভারতের সন্ন্যাসীদের বিশেষ করিয়া আহ্বান করিতে ? তাঁহাদের প্রভাব কি সংসারীদের উপর কম ?

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা কংগ্রেসের উচিত ছিল। সন্ন্যাসী-সঙ্ঘগুলি, সব মঠমন্দির যে কতখানি প্রতিক্রিয়াশীল, তাহা কি তাঁহারা জানেন? বাধা এতদিন তাহারা দিয়াছে প্রচুর। মুসলিম লীগ ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্যবৃন্দের দুয়ারে দুয়ারে ছুটিবার যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, সন্ন্যাসীদের দুয়ারে দুয়ারে ছুটিবার প্রয়োজনীয়তাও তুল্যরূপেই কংগ্রেসের রহিয়াছে। কোন মঠে, কোন ধর্মসম্প্রদায়ে কি কংগ্রেসের মেম্বর ইংরেজ আমলে ছিল? পরাধীন থাকিলেও যে ধর্মে ভগবৎপ্রাপ্তি আটকায় না, সে ধর্মকে হয় রাশিয়ার মত নির্বাসিত করা উচিত ছিল, নয় তো রূপান্তরিত করিয়া রাষ্ট্রসাধনার অনুকূলে গতিযুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মের নির্বাসন বাতুলের চেষ্টা। একমাত্র পথ রহিয়াছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের ছাঁচে ধর্ম-রাষ্ট্র-সমাজের সমন্বয় বিধান করা। পুরুষোত্তম শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে রহিয়াছে রাজনীতি-সমাজনীতি-অধ্যাত্মনীতির সমন্বয়। তাই বুঝি মহাত্মাজীর মুখে "রাম" "রাম" "রাম"। ভারতবর্ষ, তুমি এখনও মহাত্মাজীর সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতির অনুসরণ কর, ধন্য হইবে। কুম্ভ-মেলা চুপ করিয়া আছে বলিয়া জাতিসংগঠন সম্বন্ধে তাহার কোনও কথা নাই বা কর্মপন্থা নাই, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কুম্ভমেলা মন্ত্র দেয় কানে কানে কংগ্রেসের আড়ালে। অবশ্য সেই মন্ত্রের প্রভাবে ভারতবর্ষ গতিপথে ছুটিতে ছুটিতে বেশীদূর ছুটিতে পারে নাই, এলাইয়া পড়িয়াছে। অনন্ত গতিবেগের পথে ছুটিবার জন্য তাহার প্রয়োজন ছিল শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত গীতামন্ত্রের প্রেরণা। মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতির মধ্যে সেই প্রেরণারই সূত্রপাত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সংগঠনে কুম্ভমেলার দাবী, অধিকার ও যোগ্যতাকে স্বীকার করিতেই হইবে, নচেৎ স্থায়ী কল্যাণলাভ হইতে ভারত অনেক দূরে থাকিবে—ইহা যেন কংগ্রেসের সব সময় মনে থাকে।

সর্বধর্মসমন্বয় যদি দর্শনশাস্ত্রসম্মত ভাবে প্রচারিত ও স্বীকৃত হইত হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্পদায়ের মধ্যে ব্যবধান আদৌ থাকিত

না, জাতি পূর্বে না ধর্ম পূর্বে, ইহা নিয়া কোন দ্বন্দ্বই উঠিত না। সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলই হইতেছে, ভারতীয় কেন বিশ্বের সর্ব-জাতিসমন্বয়। বিশেষ কোনও ধর্মমতকেই একমাত্র ধর্মমত বলিয়া স্বীকার করার ভিতরই রহিয়াছে ধর্ম ও জাতির মাঝে ব্যবধান সৃষ্ট হইবার বীজ। বিশেষ কোনও ধর্মমতকে আঁকড়াইয়া ধরিলে জাতি থাকে ব্যাপক, ধর্ম হয় তাহা হইতে কম ব্যাপক। তখন জাতির অংশ-বিশেষকে আশ্রয় করিয়াই বিশেষ বিশেষ ধর্মমত স্ফুরিত হয়। তাই তো সর্বজাতি সংগঠনের ব্যাপারে জাতির অংশবিশেষকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত ধর্মমতকে রাজনীতির দিক হইতে নির্বাসিত করার প্রয়াস চলিতেছে। ইহার মধ্যে অসঙ্গতিও কিছু নাই। বহু ধর্মমত যদি জাতিকে বহুধাবিখণ্ডিত করিয়া বহু জাতিতে পরিণত করিতে পারে, তখন অখণ্ড জাতি সংগঠন, একরাষ্ট্র গঠন, বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা তো কল্পনার বিষয়ই হইয়া থাকিবে। ধর্মমতবাদ যদি বহু থাকিয়াই যায় তবে বহুজাতিবাদও সঙ্গে সঙ্গেই থাকিয়া যাইবে। বহু ধর্মমত থাকিতে একরাষ্ট্রসংগঠন ভাবুকের ভাববিলাস মাত্র। আপাত-দৃষ্টিতে একটা একরাষ্ট্র গঠিত করা গিয়াছে মনে করিলেও সেই একরাষ্ট্রের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে বহুজাতির বীজ রহিয়াই যাইতেছে। একরাষ্ট্রের চাপে বহুজাতিবাদ চাপা পড়িয়া আছে মাত্র, ধীরে ধীরে উহা ফুটিয়া উঠিবেই। তাই তো মহাত্মাজী রাষ্ট্রক্ষেত্রেও সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রশ্ন তুলিতে চাহিতেছেন, যাহা ধর্মক্ষেত্রে বহু পূর্বেই আসিয়া পড়িয়াছে। অথচ দেশসেবকদল এখন পর্যন্ত এদিকে উদাসীন। স্বাধীনতা আসার পর জাতিসংগঠনের ব্যাপার আরও জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে; কেন না সকলের অন্তরের পৃথক্ ধর্মমত, পৃথক্ জাতীয়তাবোধ আত্মপ্রকাশের আরও সুবিধা পাইয়াছে।

কংগ্রেসী নেতৃবর্গ তাই ধর্মের প্রশ্নকে একদম এড়াইয়া যাওয়াকেই "সহজ পথ" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সহজ পথেই যে পথ

সহজ হয় না, মুসলিম লীগের সঙ্গে দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রের শক্তি লইয়া কাড়াকাড়ির মধ্য দিয়া তাহা বেশ স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। মহাত্মাজী ছিলেন অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি জানিতেন যে, ধর্মকে বাদ দেওয়া যাইবে না ; আদিবাসীরাও তো কোন-না-কোন ধর্ম মানে, এবং ধর্মের বিভিন্নতায় জাতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে, জাতিসংগঠনের ব্যাপারে ধর্মের মত এতবড় একটা প্রকাণ্ড অঙ্গকে (factor) বাদ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না ; তাই তিনি ভারতের মত বহুধর্মমতবাদের দেশে জাতিসংগঠনের জন্যও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা গুরুতরভাবে উপলব্ধি করিতেন। কংগ্রেসীরা কিন্তু একজাতি (one nation) প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ধর্মকে রাখিয়াছেন দূরে সরাইয়া ; ফলে রাষ্ট্রক্ষেত্র ও ধর্মক্ষেত্র একান্তভাবে দুইটি ক্ষেত্রই রহিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসীরা কি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন কেন মুসলিম লীগের পাল্টা জবাব হিসাবে হিন্দুসভার সৃষ্টি হইয়াছে ? কংগ্রেস যদি মহাত্মাজীর সর্বধর্মসমন্বয়ের মন্ত্র লইয়া জাতিসংগঠনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিত তবে হিন্দুসভার প্রয়োজনীয়তাই থাকিত না।

ধর্মের উপর রাষ্ট্র গঠন হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ দুয়েরই লক্ষ্য। কংগ্রেসই শুধু চায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দ্বারা রাষ্ট্রক্ষেত্রসংগঠন। রাষ্ট্রক্ষেত্র রচনায় ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত না হইলেও ধর্ম সে চেষ্টা হইতে বিরত হয় নাই, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও কর্তৃত্ব করিবার লালসা ধর্ম পরিত্যাগ করে নাই। রাষ্ট্রের দাবী ও ধর্মের দাবী দুই-ই সত্য দাবী, কোনও দাবীই একান্ত সত্য বা মিথ্যা নয়। দুই দাবীই যখন সত্য, তখন দুইকেই সমানভাবে রাষ্ট্রসংগঠনে আহ্বান করা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে যুক্তিযুক্ত ছিল। তাহা হয় নাই বলিয়াই হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ দুই-ই থাকিয়া যাইতেছে। অজ্ঞাতসারে হিন্দুজাতি ও মুসলমানজাতি এই দুই জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। আজ শিখও একটি জাতি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও একটি জাতি, নেটিভ ক্রিশ্চিয়ানও একটি জাতি। বহুধর্মমত থাকিলে “একজাতি” (one

nation) প্রচার বা স্থাপনা দ্বারা কিছুতেই বহুজাতিত্বের বীজকে নষ্ট করা যাইবে না। বহুধর্ম-মতবাদই বহুজাতিবাদের জনক।

রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক্ রাখার ফলে যে বিষের সৃষ্টি হইয়াছে সেই বিষ পান করিয়াছে মুসলিম লীগ ও তাহার অনুগামী মুসলমানগণ। ধর্মের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়ায় মুসলিম লীগ রাষ্ট্রক্ষেত্রের সংগঠনসাধনা ও কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হইবার সুযোগ মুসলমান-সমাজকে দিতে পারে নাই। অথচ হিন্দুরা একরাষ্ট্রসংগঠনের দিকে অতিমাত্রায় অগ্রসর। কংগ্রেস একরাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা লইয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কংগ্রেস কোন বিশেষ ধর্মমতবাদীর নয়। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি যে কোনও ভারতবাসীরই উহাতে সমান স্থান ও অধিকার রহিয়াছে। হিন্দুসভার সৃষ্টি তো সেদিন হইয়াছে। এতদিন হিন্দুরাই একজাতিগঠনের পরিকল্পনা লইয়া ব্রিটিশের সঙ্গে লড়িয়াছে ; অবশ্য জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সংখ্যাও দিনের পর দিন বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুসভা আসিবার পূর্ব হইতেই হিন্দু হিন্দু-মুসলমানের মহামিলনে একরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছে। এজন্য সে বহু রক্ত দান করিয়াছে, বহু মরণ বরণ করিয়াছে ; তাই সে আজ রাষ্ট্রক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার যোগ্য। মুসলিম লীগ রাষ্ট্রক্ষেত্র সৃষ্টির যোগ্যতা অর্জনের সাধনাই মুসলমানদিগকে শিখায় নাই, কংগ্রেসকে 'হিন্দু কগ্রেস' বলিয়া মুসলমানদের বরং সেখান হইতে সরাইয়াই রাখিয়াছে। কংগ্রেস হিন্দুরও ছিল না, মুসলমানেরও ছিল না ; হিন্দু নিজ সাধনায় কংগ্রেসে স্থান অর্জন করিয়াছে মাত্র, কংগ্রেসে স্থান পাইয়া সে আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার সুযোগ অর্জন করিয়াছে মাত্র।

মুসলিম লীগের অনুবর্তী মুসলমানসমাজ আজ যোগ্যতার ক্ষেত্রে কংগ্রেসী হিন্দুদের চেয়ে পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। যোগ্যতার দাবী লইয়া একরাষ্ট্রগঠনে অগ্রসর হইবার সাহস তাহার ছিল না। সে এতদিন ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটা কাল্পনিক ক্ষমতার

অধিকারী হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার মনে রাখা উচিত ছিল, ব্রিটিশ একদিন ছিল না, একদিন থাকিবেও না। যেদিন সে থাকিবে না, সেদিন যোগ্যতাই হইবে রাষ্ট্রক্ষেত্র দখল, পরিচালনা ও নিজহাতে রাখিবার একমাত্র মানদণ্ড। যোগ্যতার ক্ষেত্রে মুসলমানকে দীনহীন রাখার ফলেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পৃথক্ জাতির জন্য পৃথক্ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দিতে হইয়াছে। জিন্নাসাহেব বেশ জানিতেন যে, হিন্দুমুসলমান-সম্মিলিত রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় মুসলমান হিন্দুর সামনে দাঁড়াইতে পারিবে না। মধ্যবর্তী গভর্নমেণ্টে যোগ্যতাসাম্য অপেক্ষা তাই তিনি সংখ্যাসাম্যের উপরই জোর দিলেন বেশী। কোনও রকমে সংখ্যাসাম্য না পাইলে তাঁহার আর দাঁড়াইবার কোনও সাহসই ছিল না। ব্রিটিশ নিজের স্বার্থে মুসলিম লীগকে 'স্বার্থপর' করিয়া তুলিয়াছিল, 'বড়' করিয়া তুলিয়াছিল, অথচ তাহার এই 'বড় হওয়া' যোগ্যতার বড় হওয়া ছিল না।

একজাতিসংগঠনের ধ্যানে হিন্দু ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া হিন্দুর স্থান রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুসলমানের চেয়ে অনেক বেশী। অযোগ্য যদি একান্নবর্তিত্বের আড়ালে অতিমাত্রায় সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারে তবে সেই একান্নবর্তিত্ব সে চায় ; কিন্তু একান্নবর্তী সকলেই যদি যোগ্যতার দাবীতে একান্নবর্তী পরিবার গড়িয়া তুলিবার দাবী উপস্থিত করে তবে অযোগ্যের পক্ষে পৃথক্ হওয়া ছাড়া সহজ পথ আর থাকে না। সুখে থাকুক দুঃখে থাকুক, পৃথক্ হইয়া নিজের মত থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কি ? কোনও দরবারে অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া সকলের সঙ্গে একত্র থাকার মতো শোচনীয় দুর্দশা আর কি হইতে পারে ? ভারতের একরাষ্ট্রীয় দরবার হইতে মুখ ঢাকিয়া তাই তো মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য এত লালায়িত ! তাহার ধারণা যে, স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নই উঠিবে না ; 'মুসলমান' বলিয়া সব কিছু সেখানে মাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু যোগ্যতার পরীক্ষা তাহাকে একদিন মুসলমানসমাজের

সামনেও দিতে হইবে, সেদিন সে তাহাদের কাছেও 'মুসলমান' বলিয়াই রেহাই পাইবে না। মুসলমানও যে 'মানুষ,' মানুষের সামনে দাঁড়াইয়াই একদিন মুসলিম লীগের কর্তাদের সে পরীক্ষা দিতে হইবে। সেদিন আগত ; আজও কি সে আঁধারের আড়ালে ঘরের কোণে মুখ লুকাইবার জন্য প্রয়াস পাইবে ? মহাত্মাজীর কর্মপদ্ধতির মধ্যে কিন্তু রহিয়াছে প্রত্যেককে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগ্য হইবার সুযোগ দানের অপূর্ব কৌশল।

বনিয়াদী শিক্ষা

বিপ্লবের চরম ও যুগোপযোগী সর্বাপেক্ষা অভিনব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা প্রবর্তনের ভিতর। এতদিন বিপ্লব ছিল জ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া ব্যাপকক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িবার বস্তু। কিন্তু কোন্ কৌশলে পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে কর্মকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লবের বিস্তীর্ণতম ও গভীরতম আস্বাদন করা যায়, এক কথায় পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রকেই অপরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে গড়িয়া তোলা যায়, তাহারই কৌশল শিখাইতে প্রবর্তিত হইয়াছে বনিয়াদী শিক্ষা। পূর্বের চিন্তাপ্রণালীতে যেখানে ছিল পরিচ্ছিন্নের শেষ, সেখানে হইতেই আরম্ভ হইত অপরিচ্ছিন্নের বা বিপ্লবের রাজ্য ; অতএব কর্মকে শেষ করিয়াই তবে বিপ্লবের আস্বাদন করিতে হইত। কর্মপ্রবাহ তাই এখানে হইয়াছিল চিররুদ্ধ। কর্মের সহিত তাই বুদ্ধির কোন সম্পর্কই ছিল না। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী এই মনোবৃত্তির উপরই গড়া। শিশুদিগের সহজ কর্মশক্তিকে পিছনে ফেলিয়া একরূপ জোর করিয়াই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের দিকে ছিল এই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই তো কর্ম সেখানে জ্ঞানের রূপে রূপায়িত হইবার সুযোগ পায় নাই। শিশুরা এই শিক্ষায় অকালপরিপক্ক বুদ্ধিমান হইতে পারে, প্রাণবান্ কর্মী নিশ্চয়ই হইবে না। বনিয়াদী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে— কেমন করিয়া শিশুরা প্রথম হইতেই প্রাণবান্ সহজ কর্মের অনুশীলন-দ্বারা তাহাদের কর্মক্ষেত্রের স্বয়ংমর্যাদা বজায় রাখিয়া সেই কর্মক্ষেত্রকেই বিশ্বরূপক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে এবং অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির পথে সহজ ও অবাধ গতিতে অগ্রসর হইয়া বুদ্ধিক্ষেত্রে সগৌরবে উপনীত হইতে পারিবে, তাহাই শিক্ষা দেওয়া। শিশুবয়সই বিপ্লবের বীজ বপনের উপযুক্ত বয়স। "কৌমারে আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ ধর্মান্ ভাগবতান্ ইহ॥"—ভাগবত। কৌমার বয়সেই

প্রাজ্ঞ ভাগবতধর্ম আচরণ করিবে। সর্বসংস্কারবর্জিত বিপ্লবের ধর্মই ভাগবতধর্ম। এই ভাগবতধর্ম আচণের বয়সই কৌমার।

বিপ্লবক্ষেত্র কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নয়, উহা রহিয়াছে কর্মক্ষেত্রের পরতে পরতে কর্মক্ষেত্রেরই বুকের মাঝে। বিপ্লবও কর্মশেষ করিয়া কর্মের বাহিরে নয়, উহা রহিয়াছে কর্মানুশীলনের প্রতি ভঙ্গীর মাঝে। কর্মানুশীলনের অন্তরস্থিত বিপ্লবের ভঙ্গী শেখানোই হইতেছে বনিয়াদী শিক্ষার প্রাণকথা। ইহাই গীতার "সহজ কর্ম"।

"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বাবস্থা হি দোষেন ধূমেনাগ্নিরবাবৃতাঃ ॥" গীতা ৪৮।১৮

হে কৌন্তেয়, সহজ কর্ম সদোষ হইলেও ত্যাগ করিবে না; ধূমদ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত, তেমনই সর্বারম্ভও দোষদ্বারা আবৃত। কর্মই জীবের "সহজ" এবং পরিচ্ছিন্নতাই উহার "দোষ"। পরিচ্ছিন্নতাদোষে দুষ্ট এই সহজ কর্ম ছাড়িয়া বুদ্ধিমান হইবার ধাঁধায় বুদ্ধিচর্চার জন্য ছুটিলে বৃক্ষের যে ডালে সে বসিয়া আছে সেই ডালকেই কাটিয়া ফেলিবার মত চরম নিবুর্দ্ধিতার পরিচয় হইবে। কর্ম জীবের "স্বস্থান", হউক তাহা পরিচ্ছিন্নতাদোষে দুষ্ট। তবুও সেখান হইতেই তাহাকে বিপ্লবের জয়যাত্রা শুরু করিতে হইবে। আর কোন্ আরম্ভই বা দোষনির্মুক্ত? কর্মকে নিগৃহীত ও সংকুচিত করিয়া বিপ্লবের পথে অভিযানও কি দোষযুক্ত নয়? এই অভিযানে প্রথম বাধা জন্মাইবে নিগৃহীত কর্মসমূহ; দ্বিতীয় বাধা আসিবে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন "অহম্" হইতে। এই দুই বাধারূপ দোষের হাত হইতে কর্মহীন বিপ্লবের একান্ত উপাসক কি করিয়া মুক্ত হইবেন? তাই তো ভগবান্ "সহজ কর্ম" হইতেই বিপ্লব বা নৈষ্কর্ম্যের অভিযান আরম্ভের কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। "সর্বত্র অসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা ও বিগতস্পৃহ পুরুষ দোষনির্মুক্ত হইয়াই সন্ন্যাসের দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বা বিপ্লব অধিগত হন।"

বিশ্বরূপে কর্মসমর্পণই কর্মসন্ন্যাস। এই কর্মসন্ন্যাসের ফলেই

কর্মের অন্তরে বাহিরে ফুটিয়া ওঠে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বা বিপ্লব। আবার এই কর্মসন্ন্যাসের জন্য প্রয়োজন হইতেছে সর্বত্র অসক্তবুদ্ধি হওয়া অর্থাৎ কোথাও আটকাইয়া না যাওয়ার বুদ্ধি লাভ করা। কোনও একান্ত মতবাদ, পন্থা বা কর্মে বুদ্ধি আটকাইয়া গেলে গণনারায়ণের সেবা আর হইবে না, হইবে শুধু নিজের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিরই কামময়ী তৃপ্তি। এই অসক্ত বুদ্ধি লাভ করার জন্য আবার প্রয়োজন হইবে বিশ্বরূপের ছাঁচে মনবুদ্ধিকে ঢালিয়া তাহাদিগকে জয় করা। এই জয়কে সম্ভব করিতে হইলে চাই কোনও স্পৃহার (desire) সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়াইয়া পড়িতে না দেওয়া, কোনও অভিসন্ধি না থাকা। চলিতে হইবে সর্বদা চতুর্দিকের আপাতপ্রতীয়মান পরিচ্ছিন্নতার আবেষ্টনের ভিতর দিয়া অথচ চলিবার ছন্দ বা ঢং যোগাইবে অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বরূপ। বিশ্বের সব পরিচ্ছিন্নই নমনধর্মশীল (flexible) বলিয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে গড়িয়া উঠিবার (transformed) যোগ্যতা তাহার রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ-লীলাও সহজকর্ম হইতে এই বিপ্লবের অভিযানের তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছে এবং ইহাই হইতেছে বনিয়াদী শিক্ষার বীজমন্ত্রের মধুর মহান্ আস্বাদন।

শ্রীকৃষ্ণাবতরণের পূর্বে বৃন্দাবনে "ইন্দ্রযজ্ঞ" প্রচলিত ছিল। এবারও ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য বৃন্দাবনে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, ব্রজবাসীরা তাহার জন্য সজ্জিত হইতেছেন। এই আয়োজন দেখিয়া পিতা নন্দের কাছে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের জন্য এই আয়োজন পিতাজী?" নন্দ মহারাজ বলিলেন—"আমরা ইন্দ্রযজ্ঞ করিব।" "ইন্দ্রযজ্ঞ করিলে কি ফল লাভ হয়?" "ইন্দ্র বর্ষণের দেবতা, যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা তিনি তৃপ্ত হইবেন, তৃপ্ত হইয়া জল বর্ষণ করিবেন। দেবতাসমূহ যদি জল বর্ষণ না করেন, কৃষিকর্মে কি ফল হইবে? কাম, লোভ, ভয় ও দ্বেষবশতঃ যে ব্যক্তি এই পারম্পর্যগত কর্ম পরিত্যাগ করে, সে কখনও সুফল প্রাপ্ত হয় না।" নন্দ মহারাজ এবং ব্রজবাসীদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্মগৌরব প্রচার দ্বারা

ইন্দ্রের ক্রোধ জন্মাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কর্ম দ্বারা জন্তু জন্মায়, কর্ম দ্বারাই বিলীন হয় ; সুখ, দুঃখ, ভয় ও ক্ষেম কর্ম দ্বারাই লাভ হয়। স্বতন্ত্র কোনও দেবতারই প্রয়োজন নাই ; যদি কোনও দেবতা থাকেনই, তিনি তো শুধুই ফলদাতা। যে কর্ম করে তাহাকেই শুধু সেই দেবতা ফল দ্বারা ভজনা করেন, যে কর্ম করে না, তিনি তাহার সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারেন না। তাই বলিতেছি, স্ব স্ব কর্মানুবর্তী ভূতসমূহের কি প্রয়োজন ইন্দ্রকে দিয়া ? নরগণের স্বভাববিহিত কর্মের ফল দান না করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রের নাই।"

আবার বলিতেছেন, "স্বভাবতন্ত্র জন স্বভাবেরই অনুবর্তন করে ; দেব, অসুর ও মানুষসহ এই সব প্রাণী স্বভাবেই স্থিত। জননশীল ব্যক্তি উচ্চ-নীচ দেহ কর্ম দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ করে। কর্মই শত্রু, কর্মই মিত্র, কর্মই উদাসীন, কর্মই গুরু, কর্মই ঈশ্বর। অতএব স্বকর্মকৃত, স্বভাবস্থ পুরুষ কর্মেরই সম্যক্‌রূপে পূজা করিবেন। যাহা দ্বারা অনায়াসে জীবিকা নির্বাহ হয়, তাহাই জীবের দেবতা। একতর বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া যে অন্য বৃত্তির সেবা করে, সে তাহা দ্বারা ক্ষেম লাভ করে না সেই অসতী স্ত্রীরই মত, যে খায়-পরে পতির কিন্তু তাকাইয়া থাকে উপপতির দিকে।"—ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ২৪ অধ্যায়। ইহার পর নাস্তিকের সুরে আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন —"রজোগুণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই মেঘসমূহ বর্ষণ করে ; প্রজা সকল তাহা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করে। মহেন্দ্র কি করিবেন ? আমাদের পত্তনও নাই, জনপদও নাই, গ্রাম বা গৃহ কিছু নাই। আমরা নিত্যবনশৈলনিবাসী, বনই আমাদের গৃহ ; অতএব গরু, ব্রাহ্মণ ও এই গোবর্ধন পর্বতের যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ইন্দ্রের জন্য যে সব দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই এই গোবর্ধনযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিন্।" ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারই নির্দেশমত গোবর্ধনযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'শৈলোঽস্মি' (আমিই শৈল) বলিয়া সমস্ত যজ্ঞ স্বীকার করিলেন। ইন্দ্র অবশ্য

ক্রুদ্ধ হইয়া জল ও শিলা বর্ষণ দ্বারা ব্রজবাসিগণকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এক হস্ত দ্বারা সহজ ছন্দে গোবর্ধনপর্বতকে উর্ধ্বে ধারণ করিলেন, বালক যেমন ছত্র ধারণ করে সেইরূপ, এবং তাহার নীচে ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দিলেন। সপ্তাহ-কাল এইভাবে থাকার পর ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ হইল, ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ লইলেন।

শ্রীকৃষ্ণজীবনের যে চিত্র এই গোবর্ধনধারণ-লীলার মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে আকাশের দিকে তাকাইয়া পথ চলিতে অভ্যস্ত একটি কর্মবিমূখ জাতিকে বাস্তব মাটীর প্রাণময় স্পর্শে স্বস্থ করিবার তত্ত্বকথা ও ভাবুক বিপ্লবীকে ঘরে ফিরাইয়া কর্মের ক্ষেত্রেই বিপ্লবের বাস্তবরূপ প্রতিষ্ঠার উপযোগী সহজ সরল ছন্দঃদানের ইঙ্গিত। গোবর্ধনধারণ-লীলা প্রচার করিয়াছে যে, মানুষের সহজ স্বকর্মই তাহার দেবতা, আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে তাহাকে নিজ বাসভূমিকেই, যজ্ঞ (Sacrifice) করিতে হইবে তাহাদের উদ্দেশ্যেই যাহাদের সঙ্গে রহিয়াছে তাহার সহজ সরল সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ এবং যাহারা যোগাইতেছে তাহার জীবিকা। ব্রজবাসী গোপবৃন্দ শৈলবাসী, বনই তাহাদের গৃহ; গোপের সহজ কর্ম হইতেছে কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্য। খাইবে পরিবে বৃন্দাবনের, ছুটাছুটির আনন্দ যোগাইবে ব্রজের গোবর্ধন; আর তাকাইয়া থাকিবে চতুর্বর্গ-ফললাভের জন্য আকাশের দিকে, ইন্দ্রের দিকে, ইহা কৃষ্ণশাস্ত্রে পরিষ্কার ব্যভিচার। কেন, ধর্ম-অর্থ-কাম এমনকি মোক্ষ প্রদান করিবার যোগ্যতা কি জড় গোবর্ধনের নাই? জড় কর্মের অন্তরে কি বিপ্লবের আস্বাদ মিলিতে পারে না যে মানুষকে জড়ের বাহিরে, কর্মের বাহিরে কোনও কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন শক্তির দুয়ারে মাথা খুঁড়িতে হইবে? কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন ইন্দ্রেরাও তো কর্মক্ষেত্রের, কর্মের অপেক্ষা করিতে বাধ্য; তাই অনর্থক আর কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন ইন্দ্রদের পূজা করা কেন? অতএব বন্ধ কর ইন্দ্রদেবের পূজা, পূজা কর স্ব স্ব ক্ষেত্রের

স্ব স্ব কর্মের, ইহারাই তোমার প্রত্যক্ষ দেবতা। গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাই শুধু প্রচার করিলেন যে, জড় জগৎ আজ ভাবুকের ইষ্ট ঐ 'আকাশে'র সমান আসন অধিকার করিবার যোগ্য, মাটির মানুষকে পদদলিত করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা ব্যভিচারমাত্র। জড়ের অন্তরেই বিপ্লবকে খুঁজিতে হইবে, আবিষ্কার করিতে হইবে, আস্বাদ করিতে হইবে, জমাইয়া তুলিতে হইবে—ইহাই ব্রজের শিক্ষা।

এই তত্ত্বকথা ভবিষ্যতের আশা-ভরসার মূর্তবিগ্রহ শিশুদের কানে কানে শুনাইবার জন্যই বনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন। শিশু-বয়সই এই দীক্ষাদানের উপযুক্ত বয়স। শিশুবয়সে বিশ্বরূপ-বীজ উপ্ত না হইলে পরিণত বয়সে হঠাৎ বিশ্বরূপ হওয়ার আশা দুরাশা। শিশু বিশ্বরূপই কুরুক্ষেত্রের 'বিশ্বরূপ' হইতে পারেন। যশোদার শিশু যে বিশ্বরূপ, ইহা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভিতর দেখিয়াছিলেন। কৃষ্ণই শুধু বিশ্বরূপ নন; আমাদের ঘরের প্রত্যেক শিশুই যে বিশ্বরূপ, প্রত্যেকের অন্তরেই যে বিশ্বরূপ নিদ্রিত রহিয়াছে, নন্দ-যশোদার স্নেহপরিপূর্ণ সেবার ফলে সব শিশুই যে বিশ্বরূপ বনিয়া যাইতে পারেন, বিরাট্ জড় জগৎই যে আবেষ্টন-রূপে তাহাদের জননী এবং সেই জড় জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকিয়া এই সহজ সরল সম্বন্ধকে ঘনাইয়া তুলিলেই যে জ্ঞানঘন বিশ্বরূপ-সাধনা ও সিদ্ধি আপনা-আপনি আসিয়া পড়িবে, ইহা তাহাদের শিশুজীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চারিত করিতে হইবে। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই আরম্ভ হইতে পারে এই শিক্ষা। পল্লীব্রজধামই হইতেছে পুরুষোত্তম-সংস্কৃতির আদি জন্মভূমি; এখান হইতেই জীবনবল্লভ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বিপ্লবময় অভিযানের আরম্ভ। মহাত্মাজীর শিশুরা ব্রজের 'বালগোপাল' ছাড়া আর কিছুই নন। বিপ্লবী বালগোপাল কৃষ্ণই এই কুরুক্ষেত্রের বুকে পার্থসারথিরূপে গীতার বক্তা হইবার যোগ্যপুরুষ। সেইজন্য

ব্রজধামকেই মানুষের 'স্বধাম' বলা হইয়া থাকে। মহাত্মাজীর কর্মপন্থাতেও গ্রামই স্বধাম, ব্রজধাম। শহরের 'ইন্দ্র'দের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সব পূজাসম্ভার দ্বারা আজ যজ্ঞ করিতে হইবে গ্রামের ও গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যেই, তবেই লাভ হইবে চরম সার্থকতা। ইন্দ্রেরা ক্ষুব্ধ হইবেন, ক্রুদ্ধ হইবেন, জল-আগুন দিয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টাও করিবেন, কিন্তু গ্রামের জড়মাটি, জড় কর্মই সেদিন কায়েমী-স্বার্থসম্পন্নদের সকল নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে—গিরিধারী জীবনের এই মহান্ শিক্ষাকে আজ কাজে পরিণত করিবার দিন আসিয়াছে।

গ্রামবাসী বয়স্কদিগকেও তাহাদের বিশ্বরূপ জীবনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শুধু আক্ষরিক শিক্ষা দিলেই চলিবে না। "বয়স্কদের শিক্ষা" প্রসঙ্গে মহাত্মাজী লিখিতে-ছেন—"কংগ্রেসীরা এই কাজটি এত অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন যে তাহা দুঃখদায়ক ; যেখানে অবহেলা করেন নাই, সেখানে অশিক্ষিতদিগকে কেবল লিখিতে ও পড়াইতে শিখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যদি আমার হাতে বয়স্কদের শিক্ষার ভার থাকিত তবে আমি শিক্ষার্থীদের মন খুলিয়া দিবার ব্যবস্থাই হাতে লইতাম এবং তাহাদিকে বুঝিতে দিতাম যে, তাহাদের দেশ কত মহান্ কত বড়। গ্রামবাসীর ভারতবর্ষ তো তাহার গ্রামের মধ্যেই নিবদ্ধ।...হিন্দুস্থান তাহার নিকট একটা ভূগোলের কথা মাত্র।" গ্রামবাসীদের অন্তরের সুপ্ত বিশ্বরূপকে অন্ততঃ ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত করিবার সাধনার ভিতর দিয়া "মন খুলিয়া দিবার" ব্যবস্থা হইলেই শিক্ষা সহজ হইয়া আসিবে। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, তাহারাই নিজেদের পঙ্গু চিন্তাপ্রণালীর মধ্য দিয়া বিদেশী শাসনকে কায়েমী করিয়াছিল, তাহারাই ইন্দ্রদেবতার সৃষ্টি করিয়াছিল যিনি জাতির সব পূজাসম্ভার এতদিন লুট করিয়া-ছেন। তাহারা যদি ঘরমুখো হয়, স্বকর্মকৃৎ হয়, স্বধামস্থ হয়,

ইন্দ্রদের অত্যাচার একদিনে ধূলিসাৎ হয়। এই রাজনৈতিক শিক্ষা তাহাদিগকে জীবন্তভাবে দেওয়া যাইতে পারে। "তাহারা এ কথা জানেন না বিদেশীরা যে এ দেশে আছে তাহা তাহাদের দুর্বলতার জন্য এবং বিদেশী শাসন দূর করার সামর্থ্য যে তাহাদের নিজেদেরই আছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্যই সেই শাসন চলিতেছে। এই হেতু আমার পরিকল্পিত বয়স্কদের শিক্ষা মানে কথায় কথায় তাহাদিগকে সত্যকার রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া।" "মন খুলিয়া দেওয়ার" ভিত্তির উপরে "মুখে মুখে শিক্ষার সঙ্গে পুঁথিগত শিক্ষাও দিতে হইবে। ইহা স্বয়ংই একটা বিশেষ বিষয়। অক্ষর শিক্ষাকাল যাহাতে কমানো যায় তাহার জন্য অনেকগুলি পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে।" ভিতর ও বাহির হইতে সমানভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে প্রতি মানুষের অন্তরের বিশ্বরূপ জাগ্রত হইবে, সঙ্ঘবদ্ধ স্বধাম গড়িয়া উঠিবে।

নারী-উন্নয়ন

নারী-উন্নয়নের দায়িত্বভার নারীকেই বহন করিতে হইবে, পুরুষদের নারী-উন্নয়ন সম্বন্ধে পরিকল্পনা নারীদের উপর চাপাইয়া দিলে উহা নারীকে আরও অবনমিতই করিবে। মনে রাখিতে হইবে যে, পুরুষ যতই উদার হউক, সে পুরুষই; কিছুতেই নারীজীবনের সর্ববিধ ব্যথার সঙ্গে সে সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারে না, পারিবেও না। পুরুষ যদি নিজের সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণের উপরে উঠিয়া এবং সেখানে দাঁড়াইয়া নারীর দৃষ্টিকোণের সঙ্গে অভিন্ন দৃষ্টি লাভ করতঃ পুরুষোত্তম হইতে পারে তবেই শুধু নারী-উন্নয়নের কার্য গ্রহণ করিতে পারে। "গঠনমূলক কার্যের ভিতর আমি নারীদের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। কেন না যদিও সত্যাগ্রহ আন্দোলন নারী-দিগকে অন্ধকার হইতে এমন করিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছে যেমন আর কিছুতেই এত অল্প সময়ে সম্ভব হইত না, তথাপি কংগ্রেসীরা সে প্রেরণা অনুভব করেন নাই যাহাতে তাঁহারা নারীদিগকে স্বরাজের জন্য যুদ্ধে পুরুষের সমান অংশ গ্রহণকারিণী বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। তাঁহারা এ কথা অনুভব করেন নাই যে, সেবার ব্রতে নারী পুরুষের সত্যকার সহায়ক"—কংগ্রেসীরা পুরুষের দৃষ্টিকোণ লইয়া নরনারী ও তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখিতেছেন বলিয়াই তাহাদের এই সত্যকথা স্বীকার করার সুবিধা হয় নাই। নারীর সেবার ব্রতে তাঁহারা পুরুষের শুধু সত্যকার সহায়কই নন, সেবার ব্রতে তাঁহারা পুরুষের অগ্রগামী গুরু। মহাত্মাজী অন্যত্র 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় লিখিয়াছেন—"In this peaceful struggle a woman can outdistance a man by many a mile. Silent and dignified suffering is the badge of her sex"—এই শান্তিপূর্ণ লড়াইয়ে নারীরা পুরুষদিগকে বহু মাইল পিছনে ফেলিয়া

আগাইয়া যাইতে পারে, নীরব ও গৌরবময় দুঃখভোগ করাই নারী জাতির গৌরব-চিহ্ন।

নারীদের আজ স্ব "ধাম" চিনিবার দিন আসিয়াছে, যেখানে স্থিত হইয়া তাহারা পুরুষের সমকক্ষতায় বিশ্বকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। তাহারা এতদিন পুরুষের গড়া আচার-নিয়মের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার ফলে তাহাদের স্ব শক্তির কোনও উন্মেষই হয় নাই। মহাত্মাজী লিখিতেছেন—"পুরুষের রচিত আচার ও নিয়মের শৃঙ্খলে নারীদিগকে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সব নিয়ম গঠনে নারীদের কোনই হাত ছিল না।" মনু লিখিতেছেন—স্ত্রী বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—স্ত্রী কখনও স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়। তাই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবার বয়স আসিবার পূর্বে আট, নয়, দশ বা এগার বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া উচিত, কেন না বার বৎসর উত্তীর্ণ হইলে নারীদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগরিত হইবে, স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হইলে প্রতিপদে পুরুষদের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই চলিবে, দুইয়ের মিলিয়া মিশিয়া ঘরকন্না করার পথ রুদ্ধ হইবে, পরিবার অচল হইবে। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" সিদ্ধান্ত একবার মানিয়া লইলে পরের যুক্তিগুলি সমীচীনই বটে।

কিন্তু "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইব কেন? তাঁহারা দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া বলিতে চান যে, পরস্পরবিরোধী নর-নারীকে দুই দুই রাখিয়া কখনও এক, অদ্বৈত করা যায় না। পরস্পর-বিরোধী মায়া ও ব্রহ্ম যেমন দুই দুই থাকিয়া কখনও এক হয় না, তেমনি নর-নারীও কখনও দুই থাকিয়া এক হয় না। আলো-আঁধার স্থিতি-গতির যুগপৎ অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।—এইসব দৃষ্টান্তের উল্লেখ তাঁহারা করেন। এই মতবাদের নিজস্ব একটি মূল্য ও অবদান থাকিলেও ইহা একদেশদর্শী। স্থিতি যে একান্ত (absolute) নয়, অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে স্থিতিকেই যে গতি বলিয়া দেখা যায়, এবং স্থিতি যে আপেক্ষিক (relative), বর্তমান যুগে "রেল লাইন ও পাশের

বাঁধের" দৃষ্টান্ত দ্বারা মনীষী আইনস্টিন তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। পুরুষ স্থিতিপ্রধান, নারী গতিপ্রধান। নর স্থিতির প্রতীক, নারী গতির প্রতীক। কেহই সমাজগঠন ব্যাপারে একান্তভাবে সত্য নয়। দুইই আপেক্ষিক সত্য। নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বয়ংপূর্ণ। পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষ সামনে, নারী তাহার পিছনে ; নারীর ক্ষেত্রে নারী অগ্রগামিনী গুরু, পুরুষ অনুচর ও শিষ্য। একই অখণ্ড সমাজের দুইটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নর ও নারী। প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকিবে অখণ্ডতার দিকে। একই অখণ্ড সমাজের মধ্যে নর-নারী পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াই পরস্পরের পরিপূরক। অখণ্ড হইতে যাত্রা করিতে না পারিলে নর নারীর সঙ্ঘর্ষ অনন্তকালেও দূরীভূত হইবে না, অখণ্ড সমাজও গড়িয়া উঠিবে না। নর-নারীর পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও পরিপূরকতার সমন্বয়ের ভিত্তির উপর গড়া সমাজই জীবন্ত সমাজ। "অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রার পরিকল্পনায় পুরুষের পক্ষে নিজের লক্ষ্যনির্ধারণের যতটা স্বাধীনতা আছে, নারীদের পক্ষে তাহাদের লক্ষ্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের ঠিক ততটা অধিকারই রহিয়াছে, "পুরুষের এই অপব্যবস্থার ফলে তাহারা নিজদিগকে নারীদের প্রভু, কর্তা প্রভৃতি মনে করিতেছে। বন্ধু ও সহকর্মী এই দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখে নাই।......নারীদের অবস্থা সেকালের সেই ক্রীতদাসের মত, যাহারা এ কথা ভাবিতেও পারিত না যে কোনদিন তাহারা স্বাধীন হইতে পারে। নারীদিগকে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা পুরুষের দাসী।"

গোড়ার দর্শনশাস্ত্র বদলাইয়া স্থিতি-গতি, ব্রহ্ম-মায়া, নর-নারীর সম-স্বাতন্ত্র্যের উপর অদ্বৈতবাদ গড়িতে না পারিলে কোনও স্থায়ী নারী-উন্নয়নের পরিকল্পনাই পরিপূর্ণভাবে সফল হইবে না। নারীরা যে আজ সমাজনিয়ন্ত্রণে কেউ নন, তাহার মূল রহিয়াছে দর্শনশাস্ত্রে। সেখানে সংস্কার না আনিলে কোনও নারী-আন্দোলনই অচলায়তন ভারতবর্ষে দাঁড়াইতে পারিবে না। দুই দিন হৈ চৈ-এর পর যেই

সনাতন, সেই সনাতন; ইস্পাত কাঠামোর মাঝে থাকিয়া মেয়েরা কিছুদিন "সমকক্ষতার" বুলি আওড়াইবে, কিছুদূর অগ্রসরও হইবে, কিন্তু সনাতনের স্থিতি তাহাদিগকে গতিক্ষেত্রে ব্যর্থতা আনিয়া দিয়া ঘরে টানিয়া আনিবেই। রক্তে-মাংসে যাহারা স্থিতিপ্রধান, বাহিরের গতিপ্রধান হাওয়ায় তাহাদিগকে গতিমান্ করিতে পারিবে না। পুরুষদের কাছে হাজার আবেদন-নিবেদনেও পুরুষ তাহাদের কায়েমী স্বার্থ (vested interest) ছাড়িবে না, ছাড়িতে পারে না। অধিকার অর্জন করিতে হয়; উহা কেহ কাহাকে হাজার চেষ্টা করিয়াও দিতে পারে না, দিলেও কেহ যোগ্য না হইয়া তাহা নিতে পারে না।

এতদিন নারীর শুধু "কর্তব্যই" ছিল, "অধিকার" ছিল না। স্বামীসেবা নারীর "কর্তব্য", কিন্তু স্বামীর উপর কোনও অধিকার তাহার নাই। রাত্রি দুপুরে কোনও আপত্তিকর স্থান হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেও জিজ্ঞাসার অধিকার নাই কেন তাহার ঘরে ফিরিতে এত রাত্রি হইল। নির্বিচারে স্বামীসেবাই নারীদের ছিল পরম কর্তব্য। অধিকারবিহীন এই সেবাই তাহাদিগকে "দাসী" করিয়া রাখিয়াছে; কোনও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও তাহাদের ছিল না, আজও নাই। কর্তব্যপালনের সঙ্গে যদি অধিকার যুক্ত না হয় তবে কি কর্তব্যপালনই সুসম্পন্ন হয়? স্বামী কোথায় কাহাদের সঙ্গে চলাফেরা করে, কি তাহার জীবনের আদর্শ, ইহা জানিবার অধিকার যদি নারীর না থাকে, কর্তব্যপালন হইবে কি করিয়া? স্বামীর জীবনের সম্যক্ পরিচয় না পাইলে কি করিয়া সে কর্তব্য পালন করিবে? স্বামীর উপর অধিকার না থাকিলে স্বামীসেবা হয় না, নিজের অধিকার না থাকিলেও নিজের বা পরিবারের সেবা হয় না। কর্তব্যপালন ও অধিকারপ্রাপ্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একেকে বাদ দিলে অপর যায় শুকাইয়া। পরস্পরের উপর পরস্পরের অধিকার স্বেচ্ছায় মানিয়া লওয়াই তো অহিংসা। একতরফা অধিকারের ফলে অসিয়াছে হিংসা ও শোষণ। কেন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাস

দিবেন—ইহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার সীতাদেবীর ছিল না ; শ্রীরামচন্দ্র একতরফা বিচারই করিয়াছিলেন। অধিকারবর্জিত সীতাদেবী এই অপমানের প্রতিবাদস্বরূপেই না পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন ? নর ও নারী যে যাহার ক্ষেত্রে স্বয়ংপূর্ণ, পরস্পরের উপর অধিকার ও কর্তব্য লইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বয়ংপূর্ণ। এই স্বয়ংপূর্ণ নর-নারীর পরস্পরের প্রাণখোলা সহযোগিতার উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে স্বাধীন ভারতের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র। প্রত্যেকেরই তাহার বিশেষ ক্ষেত্রেও এমন কতগুলি অধিকার ও কর্তব্য রহিয়াছে, যাহা অন্যে কোনও দিনই পুরাপুরি আয়ত্ত করিতে পারিবে না, সেগুলি তাহার বিশেষ অধিকার ও কর্তব্যের গণ্ডির মধ্যেই রহিয়া যাইবে। কিন্তু এমন কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য রহিয়াছে, যাহা দুই-ই সমানভাবে নিজ নিজ জীবনে কার্যকারী ভাবে আস্বাদন করিতে পারিবে। সমকক্ষতা সেই সেই সমান অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধেই চলিতে পারিবে। দেহ ও মনের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা যখন দুইয়ের মধ্যে রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে, তখন কে কতখানি পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন্ অধিকার পাইবার যোগ্য, কে কর্তব্য প্রতিপালনের দায়িত্ব লইবে, তাহার বিচার বিশেষজ্ঞদের উপরই নির্ভর করিবে। নরের সবখানি অধিকার ও কর্তব্য নারী অনন্ত কালেও সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিবে না, নারীর অধিকার ও কর্তব্যও নর তেমনি পারিবে না, দুই-ই চিরদিন দুইয়ের কাছে 'অধর' থাকিয়া যাইবে। স্বতন্ত্র, অধর নর ও স্বতন্ত্র, অধর নারী পরস্পরকে 'আপনার' করিয়া পাইবার উপযোগী ক্ষেত্ররূপে যে পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র রচনা করিবে, সেই ক্ষেত্রই পুরুষোত্তমক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র। বিনা সাধনায় সেক্ষেত্রে নর নারীকে, নারী নরকে পাইবে না। পুরুষোত্তমবিশ্বে "পাওয়ার" জন্য যোগ্য হইবার সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে। পরস্পরের এই ভাব পাওয়ার জন্য অনুকূল দর্শন, সাহিত্য, আচার-ব্যবহার প্রণয়ন করিতেও হইবে। "অহিংসায়

প্রতিষ্ঠিত সমাজে প্রত্যেক অধিকারই কোনও কর্তব্য পালনের ফলে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই কথাই দাঁড়ায় যে সামাজিক আচরণের নিয়ম উভয়ের সহযোগিতায় ও পরামর্শদ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক। এই সকল নিয়ম কদাচ বাহির হইতে চাপান যায় না। পরস্পরের সহযোগিতাই তো অহিংসা। অহিংস স্বরাজ পুরুষরাজও নয়, একান্ত নারীরাজও নয়। একান্ত পুরুষরাজ আনিয়াছে হিংসা ও নারীশোষণ। চাই স্বতন্ত্র নর-নারীর পরস্পরের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত পরিপূর্ণ স্বরাজ। প্রভু নর ও দাসী নারীর মধ্যে কোনও প্রেমসম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

মনু যেমন "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" বলিয়াছেন তেমনি "যেখানে নারী মর্যাদা প্রাপ্ত হন, সেখানে দেবতারা রমণ করেন"—ইহাও বলিয়াছেন। ব্রিটিশ যেমন ভারতবর্ষকে স্বাতন্ত্র্য ছাড়া শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সব কিছুই দিয়াছে, অথচ স্বাতন্ত্র্য না দেওয়ার ফলে শিক্ষা-সভ্যতা কিছুই দেওয়া হয় নাই, তেমনি মনু-আদি প্রাচীনেরাও ভারতের নারীদিগের সর্ববিধ শিক্ষার বন্দোবস্তই করিয়াছেন, কিন্তু দেন নাই শুধু স্বাতন্ত্র্য। শিক্ষা-সভ্যতার সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা আনয়ন করিতে পারে শুধু স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আস্বাদনই। পরবশ জাতির শিক্ষাদীক্ষা সবই আলেয়া। মনু-আদির আগমনের পূর্বে ভারতীয় নারীদের সর্ববিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ছিল; কিন্তু দার্শনিক যুগ আসার পর সর্ববিধ স্বাতন্ত্র্য হইতে নারী বঞ্চিত হইল, সকল দায়িত্বের বোঝা গিয়া পড়িল পুরুষের হাতে। দায়িত্বহীন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারবর্জিত মেয়েরা ধীরে ধীরে পুরুষের গলগ্রহ হইল, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কোনও প্রশ্নের মীমাংসায় আর তাহাদিগের সহযোগিতার প্রশ্নই উঠিল না, তাহারা পরবশতার আরামে বেশ দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু দার্শনিক যুগ প্রবর্তনের পূর্বেও কি সে এইরূপ ছিল? প্রাচীনতম ভারতের দ্রৌপদী-সুভদ্রা-দময়ন্তী প্রভৃতি নারীচরিত্র দেখিলে তো তাহা মনে হয় না।

তাঁহারা ছিলেন কি বিরাট্ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী! স্বয়ংবরের অধিকার যেদিন এ দেশের মেয়েদের ছিল, সেদিন নারীরা যোগ্যতার ক্ষেত্রে পরীক্ষা দিয়া ও পরীক্ষা লইয়াই বর গ্রহণ করিতেন। আজ আর যোগ্যতার প্রশ্ন নাই। পুরুষ পুরুষ বলিয়াই আজ যোগ্য; আর নারী নারী হিসাবেই অস্পৃশ্য। সমাজকে পুরুষ-তান্ত্রিক করিয়া গড়া হইয়াছে বলিয়াই এই দুর্দশা। সমাজ পুরুষতন্ত্র হওয়ার মূলেও রহিয়াছে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার উপর দাঁড়াইয়া সমাজকাঠামোকে গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা। প্রজ্ঞার উপর পড়ে যেখানে সমাজসংগঠনের দায়িত্ব, প্রাণ থাকে সেখানে বেকার। সমাজ তাই তো প্রাণস্পর্শহীন হইয়া সর্বদিকে প্রাণহীনতা, নিষ্ঠুরতারই আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আজ প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বয়ের উপর সমাজকাঠামো গড়িতে হইবে। নারী হইতেছে প্রাণের প্রতিভূ, পুরুষ প্রজ্ঞার। প্রাণ-প্রজ্ঞার যুগলমিলনই বিশ্বের পক্ষে পরম স্বাস্থ্যকর, ইহা গঙ্গাসাগরসঙ্গমের মত মহাতীর্থ।

আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠা

সমাজ জীবনে আর্থিক সমতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্বাগ্রে শ্রমিক ও পুঁজিপতি দুইয়ের দৃষ্টিকেই "অখণ্ড সমাজ" সংগঠনের দিকে নিবদ্ধ রাখিবার শিক্ষা দিতে হইবে এবং সর্ব যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহায়ে বুঝাইয়াও দিতে হইবে যে, সমাজ বলিতে একান্ত শ্রমিকও বুঝায় না, একান্ত ধনিকও বুঝায় না, কেহই একান্তভাবে সমাজ নয়। কাহারও একার হাতে সমাজের ষোল-আনা দায়িত্ব দেওয়া যুক্তির দিক্ হইতে বা বাস্তবের বিচারে সমীচীন হইবে না। যাহার হাতেই ষোল-আনা দায়িত্ব পড়িবে, সে-ই অপরকে দাবাইয়া রাখিবার কৌশল ও যোগ্যতা অর্জন করিবে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার অজুহাতে অপরের সকল দাবীকে নিষ্পেষিত করিবে। সমাজের দ্বিধাবিভক্ত কোনও একটি অংশের উপর দায়িত্বভার ন্যস্ত করা বুদ্ধিরই খেলা। সমাজ যতদিন বুদ্ধিকেন্দ্রিক থাকিবে ততদিন হয় একান্ত ধনিকরাজ নয় তো শ্রমিকরাজ স্থাপিত হইবেই। যে কোনও একটি রাজ রক্তাক্ত পথেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, রাখিতেও হয় তাহা রক্তস্রোত বহাইয়াই, আবার তাহা হাতছাড়াও হয় রক্তগঙ্গার ভিতর দিয়াই। একান্ত কোনও এক রাজ প্রতিষ্ঠার গোড়ায় রহিয়াছে অসত্য, হিংসা ও দুর্নীতি। উহা নিতান্তই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। আংশিক রাজ প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল বিশ্ব বহুবার ভোগ করিয়াছে। উহার মধ্যে মানুষের বুদ্ধিশাস্ত্রের দৈন্যই সূচিত হইয়াছে। আজ 'সমগ্র রাজ' প্রতিষ্ঠার বাণী ভারতবর্ষ শুনাইতেছে। সমগ্র রাজই স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম রাজ, স্বরাজ।

একান্ত ধনিক রাজের সম্বল 'বুদ্ধি'। বুদ্ধি সমস্ত কূটনৈতিক অপকৌশল অবলম্বন করিয়া সর্বত্র মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির

দ্বারা শোষণের জাল বিস্তার করে। সমাজ বুদ্ধির এই চাপে নিপীড়িত হয়। বুদ্ধির এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে তখন সমাজের অপর দিকে শ্রমিকদল, যাহাদের সম্বল হইতেছে প্রাণ ও শ্রম, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উপস্থিত করে শ্রমের চাপ ও নিপীড়ন। বুদ্ধির চাপও যেমন হিংস্র, শ্রমের চাপও তুল্যভাবেই হিংস্র। দুই-ই রক্তশোষক। ধনিক-শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদল দীর্ঘদিন কিছুই করিতে পারে নাই; কেন না বুদ্ধির অপকৌশলে তাহারা ছিল বিচ্ছিন্ন। "Divide and rule"-policy বুদ্ধিরই নীতি। ব্যক্তিগত ভাবে কোনও শ্রমিকই ধনিকদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করিতে পারে নাই। কিন্তু ধনিকদের অত্যাচারই শেষে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধনিকদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র তাহারা প্রয়োগ করিতেছে তাহা বুদ্ধিমানদেরই অস্ত্র। বুদ্ধিমানদের অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল শিখিতে গিয়া তাহারাও যে ধীরে ধীরে বুদ্ধিমানদের দলেই ভিড়িতেছে—যদিও তাহাদের বাহ্যিক চেহারা শ্রমিকদের মতই—সে দৃষ্টি তাহাদের লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহারা তাহাদের নিজস্ব ভিত্তি ঐ প্রাণকেই বিসর্জন দিতেছে। প্রাণহীন প্রজ্ঞা যেমন প্রজ্ঞাই; প্রজ্ঞাচুম্বনবর্জিত প্রাণও বুদ্ধিরই প্রচ্ছন্ন রূপ। দুই-ই মানুষের ভাববিলাস মাত্র। একান্ত শ্রম বা একান্ত প্রজ্ঞা কেহই সত্য, বাস্তব নয়। এতদিন সমাজ বুদ্ধির শোষণে শোষিত হইত, এইবার শ্রমের শোষণ চলিতেছে পূরা দমে; সমাজের বুক হইতে অত্যাচারের তাণ্ডব নৃত্য আর দূর হইল না।

অখণ্ড সমাজের যদি কোনও বাণী থাকে (নিশ্চয়ই তাহা আছে), আর সে বাণী শুনিবার মত যদি কাহারও কান থাকে, তবে সে শুনিবে কি করুণ কান্না অখণ্ড সমাজের বুক চিরিয়া বাহির হইতেছে। সেই কান্নাই আজ আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শোন, কান পাতিয়া, যাহার কান আছে, সমগ্র

বিশ্বের অন্তরের এই বুকভাঙ্গা কান্না। "এক আনা" ধনিকদল যে কান্নার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই কান্না থামাইতে গিয়া আমরা আর বিপরীত দিকে "পনের আনা" শ্রমিকদের মারফত দ্বিতীয় কান্নার সৃষ্টি হইতে দিব না। Thesis and Anti-thesis-এর লড়াইয়ের ভিতর দিয়া একান্ত anti-thesis-এর রাজত্ব আর আমরা মানিতে রাজী নই। হেগেলের ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) নামে এই অত্যাচার আমরা ঘুচাইবই। হইতে পারে আজ ইহা কল্পনা, তবুও এই কল্পনাকে বাস্তবে গড়িয়া তোলাই ভবিষ্যৎ যুগের লক্ষ্য। ইহা ছাড়া শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষে ক্লান্ত বিশ্বের সামনে অন্য কোনও আদর্শ থাকিতেই পারে না। বিরুদ্ধবাদী নিশ্চয়ই বলিবে—'এক আনা' ধনিক কিম্বা 'পনের আনা' শ্রমিকের একটা অস্তিত্ব সহজেই দৃষ্টি-গোচর হইতেছে; কিন্তু অখণ্ড সমাজ তো গোড়ায়ই একটি ভাবুকতা মাত্র। হাঁ, এই ভাবুকতার শিক্ষাই সর্বপ্রথমে দিতে হইবে। সমগ্রকে ভাঙ্গিয়া 'এক আনার' ভাবুকতা, বুদ্ধির ভাবুকতা যদি শেখানো যায়, শ্রমের ভাবুকতা, 'পনের আনার' ভাবুকতা যদি জন্মানো যায়, শ্রম-বুদ্ধি সমন্বয় রূপ অখণ্ড ভাবুকতা ও অখণ্ড সমাজরূপ অখণ্ড ভাবুকতার সৃষ্টিই বা কেন সম্ভব হইবে না? অখণ্ড মানুষই এই অখণ্ড ভাবুকতার অধিকারী; খণ্ডিত শ্রমিকও নন, খণ্ডিত ধনিকও নন। অখণ্ড মানুষের স্পর্শেই এই অখণ্ড ভাবুকতার বা বাস্তবের শিক্ষা সম্ভব হয়। Life begets life—প্রাণঃ প্রাণং দদাতি। অখণ্ড মানুষই জীবন্ত মানুষ; একান্ত খণ্ডিত শ্রমিকও মৃত, ধনিকও মৃত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই অখণ্ড ভাবুকতার প্রয়োগ কি করিয়া করিতে হইবে, তাহাই হইতেছে ভাবিবার বিষয়। কর্মক্ষেত্র তো বুদ্ধির দৌলতে দ্বিধা-বিভক্ত, এই দ্বিধা-বিভক্ত সমাজের বুকে দুইয়েরই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অখণ্ড সমাজের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কি করিয়া সম্ভব, এইবার আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

মহাত্মাজীর লিখিত সিদ্ধান্ত এই যে—"যতদিন পর্যন্ত ধনী ও ক্ষুধিত কোটি কোটি লোকের মধ্যে একটা বিরাট্ ব্যবধান রহিয়া যাইবে, ততদিন অহিংসার পথে শাসনপ্রথার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব থাকিবে। ধনীরা তাহাদের ধন ও ধন হইতে উৎপন্ন ক্ষমতা যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করে এবং তাহাদের সম্পদ যদি সাধারণের কল্যাণে বাঁটিয়া না দেয়, তবে রক্তাক্ত ও হিংস্র বিপ্লব যে একদিন দেখা দিবে সে কথা নিশ্চিত।" "নয়া দিল্লীর প্রাসাদাবলীর সহিত দরিদ্র শ্রমজীবীদের কুটিরের অসামঞ্জস্য স্বাধীন ভারতে একদিনও বরদাস্ত হইবে না, কেন না সেই ভারতের রাজ্যশাসনে দরিদ্রেরাও ধনীদের মত সমান ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে।" ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরাট্ ব্যবধান থাকিলে যে অহিংস স্বরাজের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, সেখানে হিংস্র বিপ্লব যে অনিবার্য—এ সম্বন্ধে আজিকার দিনে কাহারও মনে সন্দেহের কোন অবকাশও নাই। কিন্তু ধনীরা যে "তাহাদের ধন ও ধন হইতে উৎপন্ন ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ" করিতে পারিবে এবং সাধারণের কল্যাণের জন্য "তাহাদের সম্পদ বাঁটিয়া দিতে" পারিবে, তাহা যুক্তির দিক হইতেও অসম্ভব, দৃষ্টান্ত তো অসম্ভব বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে।

যাহারা "স্বেচ্ছায়" ধনসম্পদের মালিক হইয়া ধনিক হয় নাই, তাহারা "স্বেচ্ছায়" উহা ত্যাগ করিতেই পারিবে না। ধনিক-দিগকে ধনসম্পদের মালিক করিয়াছে ধন অর্জনের ও বণ্টনের একটা বিশেষ অবস্থা। ঐ উপার্জন বণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হইলে ধনিকদের মনে মনে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলেও বা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও তাঁহারা পারিয়া উঠিবেন না। বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থাকে কায়েম রাখিয়া অবস্থার বেশী কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই হইবে না। মহাত্মাজী যখন বলেন, "অহিংসার পথ হৃদয় পরিবর্তনের পথ বলিয়া যদি পরিবর্তন একবার ঘটে তবে তাহা স্থায়ীই হইবে," তখন তাহা বুঝি। কিন্তু হৃদয়ের পরিবর্তন সংঘটিত

হইলেই কি হৃদয়বান্ ব্যক্তিরা অর্থ বাঁটিয়া দিতে পারিবেন, যে ব্যবস্থার ভিতর ওষ্ঠে-পৃষ্ঠে-ললাটে তাঁহারা বদ্ধ সেই ব্যবস্থাকে যদি বদলানো না হয়? আর যদিই বা ধনিকদল কোনওরূপে কিছু সামান্য অর্থ শ্রমিকদিগকে বাঁটিয়া দিতে পারেন, তাহা কি ভিক্ষার দান নয়? শ্রমিকদল কি সে দান সসম্মানে হজম করিতে পারিবে? তাহারা তো উপার্জন করিল না, উপার্জন করিবার কৌশল শিখিল না। বাহির হইতে ধনের বোঝা চাপাইয়া দিলেও সে ধন শ্রমিকদলের ভোগে লাগিবে না। যে ইস্পাতের কাঠামোর চাপে ধনিক-হৃদয়ের পরিবর্তন হইলেও খুদকুঁড়াই বণ্টন করিতে পারে, তাহারই চাপে শ্রমিকও বিলানো ধন নিতে পারে না। ধনিক শ্রমিক উভয়েরই চাই আজ এই 'চাপ' হইতে মুক্ত হওয়া। এই চাপ মুক্ত হইলে ধন দিতেও হইবে না, নিতেও হইবে না, ধন আপনা-আপনি সকলের কাছে কল্যাণপ্রদ রূপে প্রয়োজনানুরূপে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

শুধু হৃদয় পরিবর্তনের কথা শুনাইলে চলিবে না। হৃদয় পরিবর্তন ও তাহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রকট করা দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। নারীপ্রগতির ধাক্কা লক্ষ লক্ষ নারীর হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু ইস্পাতের কাঠামো এই সমাজব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া কয়জন যোগিনীসাজে বাহির হইতে পারিয়াছেন? গণজাগরণের অগ্রদূত বুদ্ধদেবের মত দুই এক জন নরসিংহেরই হৃদয়ের পরিবর্তন কার্যাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহারা কাঠামোর বাহিরে আসিয়া কাঠামো বদলাইতে প্রাণপাত করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু নিজ জীবনের পথ বদলাইতে পারেন। 'হৃদয় পরিবর্তনের' আবেদন বার বার ধনিকদের কাছে করিলে অনেকের হৃদয়ের পরিবর্তন হয় তো হইবেও, কিন্তু তাহারা বুদ্ধির গড়া এই কাঠামোর চাপে অসহায় অবস্থায়ই পড়িয়া থাকিবে, কার্যক্ষেত্রে হৃদয় পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত

না দেখাইতে পারার ফলে লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণই হইয়া থাকিবে। কয়জন আর বুদ্ধদেবের মত রাজপাট ছাড়িয়া জন-সাধারণের দলে ভিড়িতেছেন?

আর্থিক সমতার প্রতিষ্ঠা চাহিলে সর্বপ্রথম কর্তব্য হইবে কাঠামো বদলানো এবং এই কাঠামো বদলানোর জন্য চাই ধনিক ও শ্রমিকের হৃদয় পরিবর্তন। হৃদয় পরিবর্তনের আবেদন শুধু ধনিকদের কাছেই করিলে চলিবে না, শ্রমিকদের হৃদয়ের পরিবর্তনও চাই যদি স্থায়ী সমাজব্যবস্থা স্থাপন করিতে হয়। "চাপ দিয়া" ধন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ধনিক ও শ্রমিক দুইয়েরই বর্জন করিতে হইবে। ইহা সম্ভব হইতে পারে যদি অখণ্ড সমাজের যুক্তিযুক্ততা, প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা দুই দলকেই বুঝানো যায়। ইহা দার্শনিকদেরই কাজ। দার্শনিকগণ যদি বুদ্ধি ও হৃদয়ের সাহায্যে এই সমগ্রের চিন্তাধারার প্রবর্তন করিতে না পারেন, শুধু হৃদয়ের পরিবর্তনে স্থায়ী সমাজ গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। সমগ্রতার ভাবে ভাবিত হৃদয়ের মধ্যেই বুদ্ধি ও শ্রম এক, অদ্বৈত, অখণ্ড। হৃদয়হীন বুদ্ধি ধনিকদিগকে শিখাইয়াছে শ্রমিকদিগের উপর চাপ দিবার কৌশল, পক্ষান্তরে হৃদয়হীন শ্রমের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া শ্রমিকদলও ধনিকদের উপর চাপ দিতেছে, টুঁটি চাপিয়া বলপ্রয়োগের দ্বারা ধন কাড়িয়া লইতেছে। এই দুই প্রচেষ্টাই কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, রক্তাক্ত। ধনিকদিগকে সহৃদয় যুক্তিবিচারে বুঝাইতে হইবে যে, শ্রমহীন একান্ত বুদ্ধি তাঁহাদের 'ধনের পুটলী' রক্ষা করিতে পারিবে না, তাঁহারা ধনেপ্রাণে মরিবেন যদি না সময় থাকিতে শ্রমের স্বয়ংমূল্য দিয়া শ্রমিকের বুকে বুক মিলাইয়া সমগ্র সমাজব্যবস্থার ভিতর দিয়া অখণ্ড সমাজজীবন যাপনের জন্য ব্যাকুল না হন। শ্রমিকদেরও বুঝাইতে হইবে যে, উপার্জনের যোগ্যতা ও কৌশল না শিখিয়া শুধু শ্রমের চাপ দিয়া অর্থ আদায় করার চেষ্টা আপাতত সফল হইতে পারে, কিন্তু উহা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বলিয়া দীর্ঘস্থায়ী কিছুতেই হইতে পারে না।

ধনসম্পদকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে চাই সর্বাগ্রে শ্রমের স্বয়ংমূল্য স্বীকার করা, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধারুচি জন্মানো ও সুশৃঙ্খলভাবে কর্ম করা। জীবনকে ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিয়া বাহিরে কর্মক্ষেত্রে তাহাকে রূপদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করাই হইবে শ্রমিক আন্দোলনের গূঢ় অভিপ্রায়। "Life is from within out"—Tryne। Education শব্দের মৌলিক অর্থও তো তাই। "Educate' শব্দের মৌলিক অর্থ e out, ducere to lead - ভিতর হইতে জীবনকে বাহিরে চালাইয়া নিয়া আসাই হইতেছে শিক্ষা।

কর্তার দায়িত্ব না লইয়া, কর্মকে শুধু জীবিকার্জনের উপায় স্বরূপ মনে করিয়া, কর্মের স্বয়ংমূল্য না দিয়া শুধুই ভূতের বেগার খাটিতে খাটিতে মরিয়াও যেন তেন প্রকারেণ গোঁজামিল দিয়া মাসান্তে মাহিয়ানা আদায় করাই যে ভৃত্যদের লক্ষ্য, তাহারাই কর্মের চাপ দিয়া, strike করিয়া মাহিয়ানা বাড়াইবার কল্পনা করে। শ্রমিকদিগকে আজ রাষ্ট্রের দায়িত্বভার নিবার উপযুক্ত মনোবৃত্তি ও কৌশল শিখাইবার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এক কথায় জীবনকে বাড়াইতে হইবে। ধনিকদের প্রতি বিদ্বেষ জাগাইয়া ধনিকদের রক্তে তর্পণ করিবার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় 'ধন' আসিলেও তাহা হাতছাড়া হইবে। কর্তাই ভোগ করে। কর্তৃত্ব করিবার উপযোগী দিনরাত আপ্রাণ শ্রম ও হৃদয়পূর্ণ সহজ যুক্তিযুক্ত কৌশল যাহার আছে সেইরূপ শ্রমিকই ভোগের অধিকারী হয়। ধনও জীবন্ত বস্তু ; কেন না বাস্তবে তো উহা বিশ্বসম্পদই। জীবন্ত ধনকে চাপ দিয়া, ফাঁকি দিয়া কিছুদিন হাতের মুঠার ভিতর রাখা যাইতে পারে, কিন্তু জীবন একদিন বুদ্ধি বা শ্রমের চাপ অগ্রাহ্য করিয়া বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িবেই, সেইজন্যই বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী।

যে জীবনে 'সমগ্র'ভাব, সর্বাত্মভাব যত বেশী, তিনি ততখানি ধনপতি। লক্ষ্মীকে কাড়িয়া নেওয়ার জন্য সব অসুরেরাই চেষ্টা করিয়াছেন। রাবণও চাহিয়াছেন সীতালক্ষ্মীর ভর্তা হইতে, কিন্তু শেষ

পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রই লক্ষ্মীপতি রহিয়া গেলেন। যে রাবণ করেন সীতা চুরি, তিনি কি করিয়া সীতানাথ হইবেন? ধনিক চুরি করিয়াই ধনিক হইয়াছে, শ্রমিকও যদি কর্মকে ফাঁকি দিয়া ধনপতি সাজিতে চায়, তাহাও ব্যর্থ হইবে; কেন না কর্মকে ফাঁকি দেওয়াও কর্মচুরি মাত্র। জীবন্ত কর্মকে জীবন দিয়াই করিতে হইবে, ইহাই সুস্থ মানবের কর্ম। স্বাধীন দেশে "চাকরে"র কর্ম থাকে না, সেখানের কর্ম হইবে বিশ্বকর্ম, স্বকর্ম। মাহাত্মাজী ঠিকই বলিয়াছেন যে, স্বরাজ লাভের পরেই এই সেবাবুদ্ধি আসিবে; তবে এই বুদ্ধির অনুশীলন এখন হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। আগে যেমন তেমন করিয়া স্বরাজ আসুক, পরে দেশসেবক হইব, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি"। যে যাহা করে, সে তাহাই হয়। "যাহারা এ কথা মনে করেন যে, বড় বড় সংস্কারগুলি স্বরাজ লাভের পর হইবে, তাহারা অহিংস স্বরাজ সক্রিয় করিবার প্রাথমিক সূত্রের স্পর্শে নিজদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন। একদা কোনও শুভ প্রাতঃকালে এই প্রকার স্বরাজ আকাশ হইতে আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে না। উহা দিনে দিনে যেমন রাজমিস্ত্রী ইটের পর ইট রাখে তেমনি করিয়া, সঙ্ঘবদ্ধ আত্মপ্রয়াস দ্বারা লাভ করিতে হইবে।" শ্রমিকদল এইভাবে শ্রমের স্বয়ংমূল্য নিয়া যখন শ্রমিক হইবে, শ্রমমর্যাদায় যখন তাহাদের বুক ভরিয়া উঠিবে, এবং এইভাবে শ্রমের গৌরবে গৌরবান্বিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের যখন সঙ্ঘ গঠিত হইবে, তখন ধনিকদের উপর আর চাপ দেওয়ার প্রয়োজনই হইবে না, বিশ্বসম্পদ সেই সঙ্ঘশক্তির আকর্ষণে তাহার সহজনীতিতেই শ্রমিকদের ঘরে আসিয়া আশ্রয় চাহিবে, লক্ষ্মীই তখন তাহাদের সেবা করিবে, লক্ষ্মী লইয়া ধনিকদের সঙ্গে আর নোংরা কাড়াকাড়ি করিয়া লক্ষ্মীর অপমান করিতে হইবে না।

লক্ষী কি কাড়াকাড়ির বস্তু? যাহা লইয়া কাড়াকাড়ি চলে, তাহা নিতান্তই অশুচি, উহা জীবনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, অপবিত্র, মহাপাপ। কাড়াকাড়ির পথ ছাড়িয়া শ্রমিকদল এইভাবে ধনের অধিকারী হইলে

ধন আর তখন ভোগের বস্তু থাকিবে না, তখন ধন হইবে বিশ্বসেব্য বিশ্বজননী। তখনই ধন ও ধনিক, শ্রম ও শ্রমিক সব সত্য, শিব ও সুন্দর। সত্য-শিব-সুন্দরের রাজই স্বরাজ। সেখানে লক্ষ্মী সমভাবেই সকলকে তার তার মত সেবা করেন। দেহ যখন সুস্থ, রক্ত তখন মস্তক হৃদয় জঠর হস্তপদ সর্বত্রই সমভাবে বিচরণ করে, কোথায়ও আটকাইয়া যাইবার ভয় থাকে না। রুগ্ন দেহেই শুধু রক্ত কোনও না কোন অঙ্গে আটকাইয়া যায়, সেখানটাকে বিষাক্ত করিয়া তোলে, কোথায়ও বা রক্তের গতি মন্থর হয়, চলাচল বন্ধ হইতে চায়। রক্ত যখন সমগ্র শরীরের সম্পদ, তখনই শুধু তাহা সকলের সম্পদ, তখন কেহই বঞ্চিত হয় না, সকলের কাছেই রক্ত সমভাবে আসিতেছে আবার ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাকে যে সকলের হইয়াই বাঁচিতে হইবে, সার্থক হইতে হইবে। লক্ষ্মী তাই চঞ্চলা ; সে কাহারও একান্তভোগ্যা হইবে না। লক্ষ্মীকে এইভাবে সকলেরই 'অধর' করিয়া রাখিলে সমাজ বাঁচিতে পারে। লক্ষ্মীকে একদলের ভোগ্যা করিতে চাহিলে লক্ষ্মী আর লক্ষ্মী থাকিবে না ; সে তখন অলক্ষ্মী। রামের লক্ষ্মী রাবণের পক্ষে লক্ষ্মী ছিলেন না। সীতা লঙ্কা পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিয়াই আসিয়াছেন। "এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি। একটিও না রহিল বংশে দিতে বাতি।" লক্ষ্মীকে দলভোগ্যা রাখিবার প্রচেষ্টার চরম পরিণতি ইহাই। লক্ষ্মীর স্বচ্ছন্দ গতিপথে বাধা দিবার ক্ষমতা বিশ্বে কাহারও নাই। আর্থিক সমতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে চাই সর্বপ্রথমে দুইয়ের কক্ষগত সমতা বা সমকক্ষতা স্থাপন। দুইয়ের যে স্বতন্ত্র মাত্রা বা মানদণ্ড (measure) রহিয়াছে, কাহারও মাপকাঠিতে যে নিজের ও অপরের ষোল-আনা প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না, সমগ্রের মাপকাঠিতে দুইকে এবং পরস্পরের মাপকাঠিতে পরস্পরকে মাপিয়াই যে সর্ব প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে—এই সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়াইয়া সর্ববিধ সংগঠনের জন্য যত্নবান হইতে হইবে। সমাজ-সংগঠনে ধনিক ও শ্রমিক সমকেন্দ্র—ইহাই আর্থিক সমতার মূল রহস্য।

অখণ্ড দেশরূপ বৃত্তের পরিধিস্থ অংশসমূহ (গ্রামগুলি) যখন হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয় তখন শহর কেন্দ্র আর কেন্দ্র থাকে না ; কেন্দ্র তখন পরিধিস্থ সঙ্ঘবদ্ধ অংশসমূহের প্রত্যেকটির মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করে। পরিধির প্রতিটি অংশই তখন হয় কেন্দ্র—ইহার আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। বুদ্ধি এতদিন ধনিককে কেন্দ্র করিয়াই সমাজ গড়িয়াছে, শ্রমিক তাই আজ সর্বহারা। শ্রম আজ ক্ষিপ্ত ; এই ক্ষিপ্ত শ্রমকে সুস্থ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বুদ্ধির মত তাহারও স্বতন্ত্র কেন্দ্র হইবার যোগ্যতাকে স্বীকার করিতে হইবে। আবার শ্রম-স্বাতন্ত্র্যের চাপে বুদ্ধি-স্বাতন্ত্র্য নিষ্পেষিত না হয় সেদিকেও সুস্থ সমাজসংগঠনেচ্ছু ব্যক্তির দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইভাবে শ্রম ও বুদ্ধির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে কেহ কাহাকেও অভিসন্ধি-পূর্বক নিজ প্রয়োজন হাসিল করিবার কাজে লাগাইবে না। তাহারা স্বতন্ত্র থাকিয়াও পরস্পরের পরিপূরকরূপে এক সমগ্র সমাজের সেবা করিবে, কেহ কাহারও ভোগ্য হইবে না। মহাত্মাজী তাই লিখিতেছেন —"রাজনীতিক্ষেত্রে পদাধিকারের জন্য কিষাণদিগকে ব্যবহার করা উচিত হইবে না। আমি ইহা অহিংস পন্থার বিপরীত মনে করি।"

শ্রমজীবী মাত্রই হৃদয়প্রধান। এতদিন বুদ্ধিমানের দল সর্বত্রই নিজেদের কর্তৃত্ব ও অধিকার বজায় রাখিবার জন্য ইহাদিগকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে ; কার্য হাঁসিল হইলে তখন আর তাহাদের ছায়া মাড়াইতেও দেখা যায় না। ভোটের ব্যাপারে এই শোষণ সর্বত্রই চলিয়া আসিতেছে। তাহারা কেন্দ্র হিসাবেই স্বতন্ত্র, বুদ্ধি-কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া তাহাদের মাপ করিলে তাহাদের সত্যিকার মাপ হইবে না—ইহা আজ প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিবার দিন আসিয়াছে। তাহাদের কেন্দ্র হইতেছে শ্রমের ভিতর ; সেইখানে থাকিয়াও তাহারা

নিজেদের মত সব প্রশ্নের, সব ঘটনার একটি মীমাংসা দিতে পারে। বুদ্ধি-কেন্দ্রের মীমাংসা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনও হয় না। শ্রমিক-দেরও যে বেশ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে তাহার পরিচয় অহরহই পাওয়া যায়। মহাত্মাজী লিখিতেছেন—"পাঠকগণ খেড়া, বারদৌলী ও বোরসাদের কিষাণ আন্দোলন পাঠ করিয়াও লাভবান হইতে পারেন। ইহার কৃতকার্যতার মূল হইতেছে এই যে, কিষাণদিগকে তাহাদের নিজ ব্যক্তিগত ও অনুভূত অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত রাজ-নৈতিক কারণে নিয়োজিত করা হইতে বিরত থাকা। একটা বিশিষ্ট অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থার অবলম্বন তাহারা বুঝিতে পারে। অহিংসা সম্পর্কে উপদেশাবলী তাহাদের জন্য প্রয়োজন হয় না, তাহারা এমন একটা কার্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োগ করে যাহা তাহারা নিজেরা বুঝিতে পারে। তাহার পর যখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত পন্থাই অহিংস পন্থা, তখন তাহারা উহাই অহিংসা বলিয়া বুঝিতে পারে।"

কিষাণরা প্রাণ দিয়া বোঝে আগে, এবং সেই বুঝ দিয়াই তাহারা কাজ করিতে পারে। প্রাণ দিয়া বুঝার ব্যাপারে তাহাদের বুদ্ধি-মানদের বুদ্ধির অপেক্ষা করিতে হয় না; প্রাণের এই বুঝ তাহাদের পক্ষে সহজ। প্রাণের এই সহজ বুঝকে পরে বুদ্ধি দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে নিশ্চয়; কিন্তু কার্যারম্ভকালে বুদ্ধিমানদের বুঝ তাহাদের না হইলেও কর্ম নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রাণের এই সহজ বুদ্ধিকে আজ স্বীকার করিতেই হইবে। কিষাণদের সহজ বুদ্ধিকে দাবাইয়া বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির মীমাংসা চাপাইতে গেলে তাহাদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে। মহাত্মাজী বলেন—"যে সমস্ত কংগ্রেসী ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝিয়া লইতে পারিবেন যে, কিষাণদের মধ্যে কেমন করিয়া কি কাজ করা যাইতে পারে। আমি এ কথা মানি যে, কতক কংগ্রেসী যেভাবে কিষাণদিগকে সংগঠিত করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের ভাল কিছুই হয় নাই—হয়ত

তাহাদের অনিষ্টই হইয়াছে।” শ্রমিকের সহজ বুদ্ধির উপর চাপ পড়ায় অনিষ্টের কথাই মহাত্মাজী বলিতেছেন।

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি শিখিতে গিয়া শ্রমিকদের বুদ্ধি হয় বিকৃত। সেই বিকৃত বুদ্ধি তখন বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির পাল্টা জবাব দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আজ জনসাধারণের এই বিকৃত বুদ্ধি বুদ্ধিমানদিগকেই শুধু বিপন্ন করে নাই, সমগ্র সমাজকেই বিপন্ন করিয়াছে। সহজ বুদ্ধি বিকৃত হইলে তাহা বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির চেয়েও মারাত্মক হয়। শ্রমিক আন্দোলনকারীদের এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। সেইজন্যই মহাত্মাজী বলিতেছেন—“পাঠক এখন বুঝিবেন আমি কেন কিষাণ এবং মজুরদিগকে অখিল ভারত সংস্থাভুক্ত করার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে নামি নাই। আমি ত কত ইচ্ছা করি যে, সকল হাতই যেন একদিকে নৌকা ঠেলে। কিন্তু আমাদের দেশের মত এত বিস্তীর্ণ দেশে হয়ত উহা অসম্ভব। সে যাহা হউক, অহিংসার ভিতর কোনও বল প্রকাশের অবসর নাই। একদিকে সাফ যুক্তি ও অপর দিকে অহিংসা প্রসূত কর্মের দৃষ্টান্তের উপর কর্ম সম্পাদনের জন্য নির্ভর করিতে হইবে।” টানাটানি করিলে প্রাণের সহজ বুদ্ধি হয় লুপ্ত, প্রাণের বিকৃত বুদ্ধি তখন যাহারা টানাটানি করিয়া দুর্বলতারই প্রশ্রয় দিতেছে, সেই সব দুর্বল মানুষদিগকে ঠকাইয়া কাজ হাসিল করিবার জন্য কোমর বাঁধে। প্রাণ লইয়া খেলা করা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। মহাত্মাজীর মত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ যেখানে হুঁসিয়ার, সেখানে হাজার হাজার কিষাণকর্মী আজ পথে ঘাটে গজাইয়া উঠিয়াছে। “Fools rush in where angels fear to tread.”

প্রাণসাধনায় সিদ্ধ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষই শুধু কিষাণ-শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব লইবার যোগ্য। কিষাণ কর্মিগণ ইষ্ট না করুক আপত্তি নাই, অনিষ্ট যেন না করেন। কিষাণের অন্তরের মানুষ একদিন জাগিবেই। সেদিন সে এই অনিষ্টকারিদের বরদাস্ত করিবে না। আবার বলি,

কিষাণ-শ্রমিকদের সহজ বুদ্ধি দাবাইয়া রাখিয়া বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির দেওয়া চাপানো সিদ্ধান্ত ও কাজ চালানোর প্রচেষ্টা তাহাদের উপর প্রকাণ্ড হিংসা, উহাতে তাহাদের সর্বনাশ হইবে। টানাটানির ফলে যাহাকে পাওয়া যায়, সে বিকৃত মানুষ । বিকৃত মানুষ স্বরাজ আস্বাদন করিতে পারে না। সহজ বুদ্ধি দিয়া আসিবে তাহাদের সব কিছুর সার্থকতা। এই আসিবার পথ খুলিয়া রাখাই হইবে কর্মীদের সাধনা। মহাত্মাজী লিখিতেছেন—"আশা করি একদিন আসিবে যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষে আমেদাবাদের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে এবং আমেদাবাদের সংস্থা অখিল ভারত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে, কিন্তু সেজন্য আমি ব্যগ্র নহি। যখন সময় আসিবে তখনই সেই দিন আসিবে।"

ভারতবর্ষকে সংগঠন করিবার জন্য আদিবাসীদেরও ডাক আসিয়াছে। 'সকল হাতই যেন একদিকেই নৌকা ঠেলে'—ইহাই মহাত্মাজীর আহ্বান। চল্লিশ কোটি ভারতবাসী জগন্নাথের রথরজ্জু ধারণ করুন, চল্লিশ কোটি রথরজ্জু ধরিয়া রথ টানিবার "বুদ্ধি" শিখিয়া প্রাণখোলা শ্রম স্বীকার করুন, তবেই না জগন্নাথের রথ সহজভাবে চলিবে ? কেহই আজ বাদ পড়িতে পারিবে না, কাহাকেও দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। কোল, ভীল, সাঁওতাল, সকলেই আজ সংগঠনকার্যের এক একটি মহান্ কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অখণ্ড দেশের বীর সন্তানবৃন্দ সকল দিকেই সংগঠন-কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ভাগবতকারও এই আহ্বানই সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে দিয়া গিয়াছেন—

"কিরাত হূনান্ধ পুলিন্দপুক্কসা
আভীর-শুহ্ম-যবনাখশাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।"

২ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক

—'পাপজাতি' বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে যেসব কিরাত, হূন, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খশাদি, তাহারাও যাঁহার আশ্রিতদের আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হইতেছে, সকল সম্ভাবনার মূর্ত বিগ্রহ সেই বিষ্ণুদেবতাকে সকল দেহ মন দিয়া নমস্কার করিতেছি।" আজ কংগ্রেসই বিষ্ণুর সেই পাদপীঠ, যাহাকে রচনা করিবার জন্য সারা ভারতবাসীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে, আহ্বানও আসিয়াছে। কংগ্রেস ও কুম্ভমেলা আজ এক হউক।

"শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুরজন।
তাই এসেছে তোমারি দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন।"

কুষ্ঠ রোগী ও পতিতা নারী

যাহারা অবহেলিত, কংগ্রেস তাহাদের আহ্বান করিয়াছে। কংগ্রেস-সেবকগণ আজ খুঁজিয়া বেড়ান কে কোথায় দীর্ঘনিঃশ্বাসে, অসহায় অবস্থায়, দৃষ্টির অভাবে দুঃখে-দৈন্যে চোখের জলে দিন কাটাইতেছে। কুষ্ঠ রোগীরা বড় অনাথ। দুঃখের সঙ্গে তাই মহাত্মাজী বলিতেছেন—"যাহারা বড় তাহারাই আমাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করেন—যদিও মনোযোগের আবশ্যকতা তাহাদের সবচাইতে কম।" কুষ্ঠ রোগীদের মতই কিংবা তাহাদের চেয়েও দুঃখী আর একটি সম্প্রদায় সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সকল রকমে অবহেলার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। কুষ্ঠ রোগীরা সমাজের মধ্যেই রহিয়াছে, আর ইহারা গিয়াছে সমাজ ছাড়িয়া। কুষ্ঠ রোগীদের চেয়েও ইহাদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। ইহারা হইতেছে সেইসব নারী, যাহাদের মধ্যে কেহ বা প্রবৃত্তির তাড়নায়, কেহ বা সমাজব্যবস্থার ত্রুটিতে, কেহ বা অত্যাচারী পুরুষ দ্বারা ধর্ষিতা হইয়া বা তাহাদের প্রলোভনে পড়িয়া সমাজের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সমাজ ইহাদের ক্ষমা করে নাই, এতটুকু দরদও প্রকাশ করে নাই। হয়ত বর্তমান বিধির অনুসরণে তাহারা তা পারেও না। কিন্তু ভারতবর্ষ যখন সগৌরবে বিশ্বের বুকে স্থান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল, তখনও কি ইহারা বাদ পড়িবে? ইহারা কি এ দেশেরই সন্তান নয়? ইহাদের সংখ্যা তো কয়েক লক্ষ হইবে। এত বড় একটা দলকে সকল সংস্কারের বাহিরে রাখিয়া ভারতবর্ষ কি করিয়া তাহার উপযুক্ত আসন লাভ করিবে? শ্রীরামচন্দ্রের যে পাদপদ্ম সীতাদেবীর বক্ষ ধারণ করিয়াছিল, সেই পাদপদ্মই কি পাষাণী অহল্যার হৃদয়ের তাপও দূর করে নাই, মানবীর পদবীতে তাঁহাকে উত্তোলিত করে নাই? লক্ষ লক্ষ অহল্যা-পাষাণীকে কোন্ প্রতিষ্ঠান আশ্রয় দিবে? কে আছে দুর্জয় সাহসী

পুরুষ, যে নির্ভীকতার সহিত ইহাদের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র কংগ্রেসের মধ্যে স্থান দিবার জন্য প্রাণপাত করিবে? শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় সাধু-অসাধু, সতী-অসতী সকলেই সমানভাবে জুড়াইবে? ভারতবর্ষ আজ আর শুধু সাধুদের বা সতীদের ভারতবর্ষ নয়। ভারতবর্ষের যে কোনও সন্তানই ইহার সেবা করিবার অধিকারী। পবিত্রতার মূর্তি, উচ্চ আদর্শনিষ্ঠ, শৃঙ্খলাবদ্ধ নারীসঙ্ঘেরই এই কার্যভার গ্রহণ করিবার অধিকার রহিয়াছে। পুরুষদের ক্ষেত্র এখানে নয়। তবে যাঁহারা সংযমী, তাঁহারা নারীদের এই কার্যে বিশেষ সহায়তা দান করিতে পারেন। এই মহান্ ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে নারীদের জন্যই সাজানো রহিয়াছে। তাঁহারা সতীত্বের শক্ত সংস্কার ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রেমে এই সব দুঃখিনীদের বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বিশ্বরূপের সাধনায় দীক্ষা দান করুন—ভারতের পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ইহাই তাঁহাদের কাছে দাবী করিতেছেন।

বিপ্লবগর্ভ কর্মের যে বীজ কৌমারে বোনা হইয়াছিল, তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া কৈশোরে জ্ঞানমুখী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কৌমারের কর্ম গড়িয়া উঠে কৈশোরের বুদ্ধির অনুশীলনের রূপে। তাই তো "বয়ঃ কৈশোরকম্ ধ্যেয়ম্"—কৈশোর বয়সেরই ধ্যান করিবে। কেন না কৈশোর বয়সই সৃষ্টিকৌশল শিখিবার উপযুক্ত বয়স। গড়িয়া তোলাই কৈশোরের ধর্ম, জীবনের ধর্ম। এই গড়িয়া তোলার বয়সে যদি বিশেষ কোনও মতবাদে, পন্থায় বা কর্মে কিশোর ছাত্র আসক্ত হয়, আটকাইয়া যায়, তখন অন্যগুলির উপর পড়িবে চাপ, সেগুলি থাকিবে নিপীড়িত (repressed)। তখন হইবে জীবনে জটিলতার সৃষ্টি, সহজ জীবনের গতি হইবে ব্যাহত, এবং একটি বিকৃত জীবনের সৃষ্টি তখন অনিবার্য। এই বিকৃত জীবন নমনধর্মশীল, সর্বসমন্বিত বাস্তব বিশ্বের সামনে দাঁড়াইয়া তখন বিশ্বের বস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যা দিবার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত হইবে, সত্য বাস্তব অকৃত্রিম অখণ্ড সৃষ্টি-রচনায় ব্যর্থ হইবে। সেইজন্যই মহাত্মাজী বলিতেছেন—"ছাত্রদিগকে হাতে পাওয়ার জন্য আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামি নাই এবং উহার কারণ তাহাই, যে কারণে আমি কিষাণ বা শ্রমিকদের জন্য নামি নাই। আমি নিজেই তাহাদের একজন সতীর্থ। কেবল আমার 'বিশ্ববিদ্যালয়' তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভিন্ন।" 'বিশ্ববিদ্যালয়' পদের সার্থকতা হইবে তখনই, যখন বিশ্বের সর্ববিদ্যার সমন্বয়কৌশল শিখিবার আলয়-রূপে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠিবে। বিশেষ বিশেষ আলয় তো আর বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

আচার্য শঙ্কর লিখিতেছেন—"বস্ত্বধীনা ভবেদ্বিদ্যা কর্ত্রধীনো ভবেদ্বিধিঃ"—'বিদ্যা হইতেছে বস্তুর অধীন, আর বিধি হইতেছে কর্তার অধীন'। অখণ্ড বিশ্বই বস্তু, অখণ্ড বিশ্বের জনসমূহই বস্তু, অখণ্ড

জনসমূহের অখণ্ড সাধনাই বস্তু, অখণ্ড সাধনার সিদ্ধিই বস্তু। এই বস্তুর বস্তুত্ব রক্ষা করিয়া যে বিদ্যা, তাহাই সার্থক বিদ্যা। আর কর্তা যেখানে অখণ্ডকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিয়া বিশেষ বিশেষ খণ্ডের দৃষ্টিতে বিশ্বে তাহার সাধনা ও সিদ্ধি গড়িতে চায়, সেখানেই আসিয়া পড়িবে 'বিধি'; বিদ্যার স্থান অধিকার করিবে তখন বিধি। বিদ্যা-সাধককে তাই তো কখনও কখনও বিদ্যালাভের অন্তরায়স্বরূপ যে 'বিধি' সৃষ্ট হয় সেই বিধি ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই বিধিকে উল্লঙ্ঘন করার নামই "আইন অমান্য," যাহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। ইহার সঙ্গে দলগত রাজনীতির কোনও সংস্রব নাই, ইহা বিদ্যা-সাধনার সহায়ক হিসাবেই ছাত্রদের নিজস্ব ব্যাপার। তাই তো মহাত্মাজীর নির্দেশ—"ছাত্রেরা দলগত রাজনীতিতে যোগ দিবে না। তাহারা ছাত্র, অনুসন্ধিৎসু, কিন্তু তাহারা রাজনীতিজ্ঞ নহে।" দলগত রাজনীতি বিশেষ মতবাদের (ism) উপর গড়া; বিশেষ কতগুলি এক-ছাঁচে গড়া মানুষ লইয়াই তাহাদের আন্দোলন। বিশ্বে একদল মানুষের আন্দোলন কিছুতেই সর্বজাতীয় মানুষের অন্তরের চাহনি পূরণ করিতে পারিবে না। অথচ ছাত্রদের শিক্ষা করিতে হইবে অখণ্ড বিশ্বের অখণ্ডত্ব বজায় রাখিয়া একটি অখণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করার যোগ্যতা-অর্জনকৌশল। সেইজন্যই তো ছাত্রদের সর্বাগ্রে সব মতবাদ, সেই সেই মতবাদের অনুসৃত পথ এবং সেই সব পথে প্রাপ্তব্য স্বাধীনতার দোষগুণের চুলচেরা অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনুসন্ধিৎসায়ই বাধা পড়িবে, যদি সে কোনও দলগত রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়ে। কোনও মতবাদ বা তাহার সাধনা ও সিদ্ধিতে আটকাইয়া যাওয়াই হিংসা; কেন না অন্য মতবাদকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই তখন সে হইবে উন্মত্ত। অহিংসাব্রতীই শুধু সর্ববাদসমন্বিত জীবনবাদ, সর্বসাধনাসমন্বিত জীবনসাধনা, সর্বসিদ্ধিসমন্বিত স্বরাজসিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ছাত্রদের চাই এই অহিংসাবৃত্তির অনুশীলন বা উপযুক্ত অনুসন্ধিৎসা।

"অহিংসার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানে ধৈর্যের সহিত অনুসন্ধিৎসা এবং আরো অধিক ধৈর্যের সহিত কঠিন প্রয়োগ আরম্ভ করা।"

কিষাণ ও শ্রমিকদের যেমন একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে, ছাত্রদেরও তাহাই আছে বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া রাজনৈতিক কাড়াকাড়ির বিরুদ্ধে মহাত্মাজী বারবার বলিয়াছেন। প্রতি দলগত রাজনীতি এই তাজা প্রাণগুলিকে লইয়া দল গড়িবার জন্য নানাবিধ মায়াজাল সৃষ্টি করে, নানাবিধ পুষ্পিত বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া তোলে। দলগত নীতি দ্বারা তাহাদের অখণ্ড সৃষ্টির যোগ্যতাই শুধু অপহৃত হয়। অখণ্ড সৃষ্টি নির্ভর করে সর্বসমন্বয়ের উপর।

বর্তমান যুগের আদর্শ হইতেছে সেই সত্য বাস্তব আদর্শ, যাহা আজ যুগ রচনার জন্য এতদিনকার খণ্ডিত খণ্ডিত আদর্শসমূহের সমন্বয়ে এক অখণ্ড আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উদ্ভাসিত হইতেছে। ছাত্রদের জন্য এইরূপ আদর্শের অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োগকৌশল শিক্ষাই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। এই আদর্শ বরণ করিয়া লওয়ার পরে তাঁহারাই বুঝিবেন, কোন্ ধারার কোন্ কোন্ কার্যক্রম অনুসরণ করিলে তাহাদের অন্তরের দেবতা জাগ্রত হইবেন। তখন ছাত্রদের সম্বন্ধে মহাত্মাজীর নির্দেশের অর্থ পরিস্ফুট হইবে—"তাহাদের প্রতি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য, গবেষণা কার্যে আমার সহিত যোগদান করিবার জন্য আমার স্থায়ী নিমন্ত্রণ রহিয়াছে।" মহাত্মাজীর আমন্ত্রণের সর্তগুলি প্রতিপালনের মর্ম হইতেছে ছাত্রদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত কিশোর-পুরুষোত্তমকে জাগাইয়া তোলা। ছাত্রগণ এই আমন্ত্রণে সাড়া দিলে তাঁহারাও ধন্য হইবেন, দেশও অখণ্ড সাধনা ও সিদ্ধিলাভে ধন্য হইবে।

আইন অমান্যের স্থান

"বস্তুতন্ত্রং ভবেদ্ জ্ঞানম্"—জ্ঞান সব সময়েই বস্তুতন্ত্র। বস্তুতান্ত্রিকতাই জ্ঞান—ইহাই তত্ত্ব। যাহা কিছু বস্তুতন্ত্র, তাহাই জ্ঞান, তাহাই বিপ্লব। ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীই বস্তু। জীবন যখন যতখানি এই বস্তুতন্ত্র হইবে, তখন ততখানিই হইবে জীবনে বস্তুতন্ত্র বাস্তব স্বরাজপ্রাপ্তি। ইহাই বিপ্লবের ব্যবহারিক দিক। মহাত্মাজী লিখিতেছেন—"যদি দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা গঠনমূলক কার্যে পাওয়া যায় তবে অহিংস পথে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আইন অমান্য করিতে হইবে এমনটি না৷ও হইতে পারে। কিন্তু এই প্রকার সৌভাগ্য ব্যক্তি বা জাতির অদৃষ্টে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য দেশজোড়া অহিংস প্রচেষ্টার ভিতর আইন অমান্যের স্থান কোথায় তাহা জানা দরকার।" চল্লিশ কোটি মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হইলে আইন অমান্যের প্রয়োজন হয় না, তত্ত্বতঃ ইহাই সত্য কথা। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা তো আর কোনও দিন বাস্তবে পরিণত হইবে না, একদল বাধা দিবার জন্য চিরদিনই থাকিবে। কাজেই চিরদিনই আইন অমান্যের স্থান থাকিয়া যাইতেছে, তাহার কৌশলও তাই শিখিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

বিপ্লব বস্তুতন্ত্র; বিদ্রোহ কর্তৃতন্ত্র। বিপ্লব গঠনাত্মক; বিদ্রোহ ধ্বংসাত্মক। বিপ্লব অহিংস, বিদ্রোহ হিংস্র। বিপ্লবের মধ্যে বিদ্বেষের কোনও স্থান নাই, পক্ষান্তরে বিদ্রোহ বিদ্বেষমূলক। ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া বিদ্রোহই শুধু করা হইয়াছে, উহা বিপ্লব হয় নাই। বিপ্লবের মূলে রহিয়াছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জনসাধারণের অখণ্ডতার সঙ্গে প্রেমের যোগ। বিদ্রোহে কর্তা

নিজকে সমগ্র হইতে খণ্ডিত করিয়া নিজেরই খণ্ডিত বুদ্ধির সাহায্যে দলগত প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া খণ্ডিত কর্মসাধনা ও সিদ্ধির পথ বাছিয়া লয়। ইহা কর্তৃতন্ত্র বলিয়া এখানে বিচ্ছিন্ন বহু কর্তা, বিচ্ছিন্ন বহু মতবাদ ও বহু কর্মপদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করে। পক্ষান্তরে বিপ্লব বস্তুতন্ত্র বলিয়া তাহার পশ্চাতে থাকে একটা কর্মপদ্ধতির দিব্য জ্ঞান ও প্রেরণা। তাই মহাত্মাজী বলিতেছেন—"স্বাধীনতা লাভের অঙ্গীভূত আইন অমান্য করিতে হইলে তাহাতে যদি লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া সহযোগিতা না থাকে তবে সে আইন অমান্য কেবল বৃথা আড়ম্বর এবং একেবারেই অন্তঃসারশূন্য বস্তু, এ কথা পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হওয়া চাই।" মহাত্মাজীর ভাষায় কর্মপদ্ধতিই হইতেছে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি। কর্মপদ্ধতি পূর্ণ স্বরাজের 'শরীর'ও বটে, শরীরী পূর্ণ স্বরাজ স্বয়ংও বটে। শরীর-শরীরীর ভেদ এখানে বিলুপ্ত। আবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তিরূপ কর্মপদ্ধতির শরীর হইতেছে আইন অমান্য। আইন অমান্যের পিছনে থাকা চাই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি। আইন অমান্য কেন? স্বরাজপ্রাপ্তি বলিতে যে কর্মপদ্ধতি ও তাহার যে কৌশল আমরা বুঝিতেছি, সেই কর্মপদ্ধতি ও কৌশলকে কার্যে পরিণত করিতে ব্রিটিশ-শাস্ত্র বিধি সৃষ্টি করিয়া ও আইন-শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া যে বাধা জন্মাইয়াছিল, সে বিধি উল্লঙ্ঘন তো করিতেই হইবে। ব্রিটিশও একটা কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে তাহার ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সত্য-ভারতের অখণ্ডত্ব রক্ষা পায় নাই। ব্রিটিশের বিধি ভারতকে অসংখ্য টুকরায় বিভক্ত করিয়াছিল, সেই বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার সর্ববিধ ব্যবস্থা এমন সুকৌশলে করা হইয়াছিল যে, এই ব্রিটিশবিধি বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত লক্ষ বৎসরেও ভারত অখণ্ড ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। "Divide and rule" ইহাদের নীতি; বুদ্ধিমান ভাবুকদের নীতিও তাহাই।

উহা বস্তুতন্ত্রবিরোধী, হিংস্র, এবং শোষণের দূতী। এই হিংস্র শোষণের সঙ্গে লড়াই করিতে হইলে চাই সর্বাগ্রে বাস্তব সহজ অখণ্ডতাকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযোগী বিদ্যার অনুশীলন, অখণ্ড সঙ্ঘগঠনের কৌশল শিক্ষা ও কার্যাত্মক রূপে তাহার প্রয়োগের জন্য ধৈর্যসহকারে দিনের পর দিন লাগিয়া থাকা। ব্রিটিশের law-and-order হইতে ইহার law-and-order নিশ্চয়ই উন্নত স্তরের। পূর্ণ স্বরাজের law-and-order অবলম্বন করিলেই তো আপনা-আপনিই ব্রিটিশের law-and-order অমান্য হইয়া পড়িবে; কেন না ব্রিটিশ তাহার law-and-order জোর করিয়াই চালু রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। মহাত্মাজী বলিতেছেন —"এই হেতু কর্মীরা আইন অমান্য করিবার অবকাশ খুঁজিবেন না। যদি রচনাত্মক কর্মকে নিষ্ফল করার চেষ্টা চলে তবেই তাহারা আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইবেন।"

মানুষের অন্তরের সহজ বিশ্বরূপ মানুষটিকে জাগ্রত করিয়া তোলাই হইতেছে সকল কর্মপদ্ধতির মূল রহস্য। তাহাই হইবে সকল সমাজ-রাষ্ট্র রচনার ভিত্তি, এই ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার সনাতন অধিকার মানুষের আছে ও থাকিবে। সেই মূল অধিকারের প্রতিষ্ঠায় যদি কোনও শক্তি বাধা জন্মায়, সে বাধা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রত্যেক সত্যকামী মানুষ বাধ্য। এই ভিত্তি রচনার ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সাধনায় যে ক্ষেত্রে যতটুকু বাধা আসিবে, সেই ক্ষেত্রে ততটুকু সাহস করিবার জন্যই কর্মীদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। রাজনৈতিক বা সামাজিক চুক্তি যদি সহজ মানুষের সহজ জীবনকে দাবাইয়া রাখিতে চায় তবে সে চুক্তি তো ভাঙ্গিতেই হইবে। আইন অমান্য উচ্ছৃঙ্খলতা নয়; ভগবত সহজ শৃঙ্খলার পরিপূর্ণ আস্বাদনই হইতেছে আইন অমান্য; ইহা অকৃত্রিম সহজ জীবনেরই আস্বাদন, অথচ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান। "আইন অমান্য পদ্ধতি হইতেছে একদিকে সংগ্রামনিরত লোকদের

পক্ষে কর্মের প্রেরণাস্বরূপ, এবং অপর দিকে প্রতিপক্ষের বর্তমান ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের প্রতি যুদ্ধের আহ্বানস্বরূপ।”

আইন অমান্য দু-মুখো ; এক মুখ রহিয়াছে জনসঙ্ঘ রচনায় প্রেম-রসাস্বাদনে নিরত, অপর মুখ রহিয়াছে যুদ্ধঘোষণায় ব্যাপৃত। “জটিলা, বলগে যা তুই নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।” দেশসেবক দল যখন দেশপ্রেমিক, যখন দেশপ্রেমের কলঙ্কসাগরে তাহারা ডুবিবেন, তখন দেশপ্রেমে বাধা উৎপাদনকারী জটিলা-কুটিলার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বিজয়নির্ঘোষ তো করিতে হইবেই। এই বিজয়াভিযান উচ্ছৃঙ্খল হইবে না যদি “তাহাদের সাক্ষাৎভাবে ও জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত কর্মপ্রচেষ্টা উহার পিছনে” থাকে। কর্মপ্রচেষ্টা-বর্জিত বিজয়াভিযান উচ্ছৃঙ্খলতা আনিবেই, জাতির সহজ জীবনকে পঙ্কিল করিবেই। তাই তো বিপ্লব ও বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। মহাত্মাজীর স্বরাজ সাধনাই বিপ্লবাত্মক ; ইহার বাহিরে সব সাধনাই বিদ্বেষবহুল, বিদ্রোহাত্মক। উহাতে ‘সহজ মানুষ’টি চাপাই পড়িয়া যাইবে, কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক জীবন যাপনের পথই খুলিয়া যাইবে, বিকৃত জীবন বিকারের মধ্যে হাবুডুবু খাইবে। “এই রচনাত্মক কর্মপদ্ধতির লক্ষ্য হইতেছে ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া উপর পর্যন্ত জাতি গঠন। চল্লিশ কোটি লোকই স্বরাজের ভিত্তি ; বস্তুতঃ এই ভিত্তি অবলম্বনে স্ফূরিত হয় বিপ্লব। এই সমস্ত অখণ্ড ভিত্তির বাহিরে যত কিছু খণ্ড তাহা বাস্তব হইতেই পারে না। সেইসব কাল্পনিক ভিত্তি-গুলিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় যে আন্দোলন তাহা বিদ্রোহ মাত্র, উহার কোন স্থায়ী ফল নাই। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে —“সবার উপরে মানুষ সত্য”, সর্ববিধ সামাজিক রাজনৈতিক চুক্তিরও উপরে রহিয়াছে মানুষে মানুষে সহজ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধকে যথাযথ মর্যাদা দিয়া সমাজ-রাষ্ট্র গড়িয়া তোলাই হইবে আইন অমান্য আন্দোলনের নিগূঢ় প্রয়োজন। এই আইন অমান্যের জন্য রীতিমত

ট্রেনিং চাই। এই ট্রেনিং লওয়ার মধ্যে কোনও চাপাচাপির স্থান থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"এ সংসারে আর যাহারা আমায় ভালবাসে।
তারা সবাই ধরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে॥
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া তাই তোমারি নূতন ধারা।
বাঁধো নাকো লুকিয়ে থাক ছেড়েই রাখ দাসে॥"

কঠিন পাশে "বাঁধিয়া রাখার" দিন বিশ্বে আর নাই ; বিশ্বে আজ আসিয়া পড়িয়াছে "ছাড়িয়া রাখিবা"র দর্শন ও সংগঠন। এই নীতি আজ পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। ব্রিটিশ আইন-শৃঙ্খলার কঠিন পাশে বাঁধিয়া রাখিবার প্রাণপণ প্রযত্ন করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে। এখনও বাঁধিয়া রাখিবার বুদ্ধি থাকিলে ভারতবর্ষের সঙ্গে অনন্ত কালের জন্য ছাড়াছাড়ি হইবে। আইন অমান্যের এই গূঢ় রহস্য জানিলে বুঝা যাইবে কোন্ ক্ষেত্রে কখন ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহা কোন্ কর্মাভিমুখী হইবে, কখন ইহা ব্যক্তিগত হইবে, কখন বা ব্যাপক হইবে, ইত্যাদি। মানুষের জীবনে না-মানার রস অস্বাদন করিবার একটি সনাতন প্রেরণা রহিয়াছে, সেটির সুযোগ আসে যখন সামনে অগ্রসর হইবার জন্য পিছনের স্তর ডিঙ্গাইতে হয়। পশ্চাতের পুরাতন, মৃত law-and-order না মানিয়া নবীনতর, জীবন্ত আইন-শৃঙ্খলার দিকে অগ্রসর হওয়ার মধ্যেই আইন অমান্যের সার্থকতা। মৃতকে পিছনে ফেলিয়াই কিংবা হজম করিয়া জীবিতের রাজ্যে অভিযানের বেদনার গতিই হইতেছে আইন অমান্যের প্রাণ। এই আইন-অমান্য তাজা সহজ মানুষের সনাতন সম্পদ। মানা ও না-মানার সমন্বয়ই মানুষের জীবনকে অগ্রগতির পথে প্রেরণা দেয়। একান্ত মানায় মানুষ হয় ক্লীব ও পরবশ ; একান্ত না মানায় আসে উচ্ছৃঙ্খলতা। দুইয়ের সমীকরণই সভ্য বাস্তব জীবনের লক্ষণ।

বন্দে মাতরম্